সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

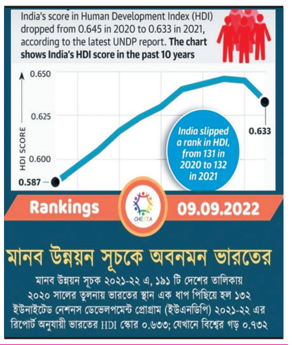

তৃতীয়-চতুর্থ সংস্করণ, জুলাই-আগস্ট ২০২২ ■ ৫০তম বর্ষ ■ মূল্য ২ টাকা

শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের রাজ্যব্যাপী দু'ঘণ্টার কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ কর্মসূচী

রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন পান এমন সমস্ত অংশের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা ২০১১ সালে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রাপ্তির প্রশ্নে বিপুল বঞ্চনার শিকার।

পূর্বাঞ্চল

খাদ্যভবন

অথচ রাজ্যের বর্তমান শাসকদল ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রকাশিত দলীয় ইশ্‌তেহারে মহার্ঘভাতা বকেয়া না রাখা, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সাথে বেতন-ভাতার সমতা

হাইকোর্ট

বিধানের জন্য মহার্ঘভাতার স্থায়ী আদেশনামা প্রকাশ সহ বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত ভাতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পরে প্রদত্ত

নবমহাকরণ

প্রতিশ্রুতি রূপায়ণ তো দূরের কথা, ঠিক উল্টো পথে হাঁটতে শুরু করে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সাধারণভাবে বছরে দু'বার, কখনও কখনও তিনবার মহার্ঘভাতা প্রদান করা হত। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে তা নেমে আসে বছরে একবার অথবা একবারও নয়। যখন মহার্ঘভাতা ঘোষণা করা হয়েছে, তখনও কেন্দ্রীয় হারকে অনুসরণ না করে, ইচ্ছেমতো ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি বামফ্রন্ট সরকার সর্বশেষ যে ভোট অন অ্যাকাউন্ট বাজেট বিধানসভায় পেশ করেছিল, সেখানেও শিক্ষক ও কর্মচারীদের

মালদা

জন্য ১০ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান শাসকদল ক্ষমতায় এসে কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা না দিয়ে ঐ টাকা আত্মসাৎ করে। মহার্ঘভাতা নিয়ে বঞ্চনা ষষ্ঠ বেতন কমিশন চালু হওয়ার আগে যেমন ছিল, বেতন কমিশন চালু হওয়ার পরেও তেমনই চলছে। বেতন কমিশন চালু হওয়ার আগে

বর্ধমান

● নবম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

পতাকা উত্তোলন-আলোচনা সভা-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

স্বাধীনতার ৭৫ বছর প্রতিপালন

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে ভারতের স্বাধীনতা দিবসের

পতাকা উত্তোলন, আশিস ভট্টাচার্য

৭৫তম বর্ষপূর্তিতে দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনে। পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সভাপতি আশিস ভট্টাচার্য। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় দপ্তরের অরবিন্দ সভাকক্ষে একটি

আলোচক প্রবীর মুখার্জী

আলোচনা সভা সংগঠিত হয়। আলোচনা সভার প্রস্তাবনা করতে গিয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ বলেন স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষপূর্তি যখন দেশজুড়ে চলছে তখন নতুন করে দেশের সংবিধানের মর্মবস্তুর মূলেই কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের অংশ হিসাবে কর্মচারী সমাজের দায়িত্ব দেশের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতা গণতন্ত্রকে রক্ষা করা। আলোচনা সভার মূল আলোচক কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীন নেতৃত্ব তথা সংগঠনের প্রাক্তন সহ সম্পাদক প্রবীর মুখার্জী বলেন, বহু মানুষের লড়াই, আন্দোলন, আত্মত্যাগ, জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। দেশের সংবিধান বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক অধিকার, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধাঁচে গড়ে তোলা জনকল্যাণকর ভূমিকা প্রতিটি ক্ষেত্রই আক্রান্ত, সংকুচিত, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও দলিত ছাত্রকে খুন হতে হয় উচ্চবর্ণের ছাত্রদের খাওয়ার জলে হাত দেওয়ায়। স্বাধীনতা আন্দোলনে বামপন্থীদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে অস্বীকার করে যারা সেই সময় ইংরেজ শাসকদের মুচলেকা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তাদের দেশপ্রেমিক সাজিয়ে নতুন ইতিহাস রচনা করার উদ্যোগ চলছে। মানুষ প্রতিবাদ করলেই তাদের দেশদ্রোহী তকমা দেওয়া হচ্ছে। আসলে দেশকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন সংবিধানের বিভিন্ন ধারা সংশোধন, অভিন্ন দেওয়ানী বিধি প্রণয়ন, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ প্রভৃতি। বামপন্থী সহ দেশের প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব, এই সকল সংশোধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করা। দেশের

বিজয় শঙ্কর সিংহ

সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা। আলোচনা সভার শুরুতে সভাপতি আশিস ভট্টাচার্য ভারতের সংবিধানে

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

লিপিবদ্ধ প্রস্তাবনা পাঠ করেন এবং উপস্থিত সকলে তা শপথ হিসাবে উচ্চারিত করেন।

আলোচনা সভা শেষ হওয়ার পরে, ঐ সভাকক্ষেই একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সংগঠনের সদস্য ও সদস্যরা আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, গীতি আলোচ্য ইত্যাদি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে সাধারণ সম্পাদক অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। □

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় রক্তদান এবং মরনোত্তর দেহদান ও চক্ষুদানের অঙ্গীকার কর্মসূচী

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে ১৪ জুলাই ২০২২ বৃহস্পতিবার সংগঠনের

উদ্বোধক বিশিষ্ট অভিনেতা দেবদূত ঘোষ

কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনে রক্তদান এবং মরণোত্তর চক্ষুদান ও দেহদানের অঙ্গীকার কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। রক্তদান কর্মসূচী জেলা / সমিতিগত ধারাবাহিক ভাবে প্রতিপালনের সাথে সাথে বিগত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে কেন্দ্রীয় দপ্তরে রক্তদান কর্মসূচী প্রতিপালিত হচ্ছে, যা কোভিড পরিস্থিতিতেও ধারাবাহিকতা হারায়নি। এবছর একই সঙ্গে মরণোত্তর চক্ষুদান এবং দেহদানের অঙ্গীকার কর্মসূচীও আহুত হয়েছিল কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে। আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীরা ৬ জন মহিলা সহ সর্বমোট ১০২ জন রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করেন। অপরদিকে 'মুক্ত চিন্তা' নামক একটি সামাজিক সংগঠন ৯ জন মহিলা সহ ৭৬ জনের কাছ থেকে চক্ষুদান এবং মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার পত্র সংগ্রহ করে। রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে কলকাতার ৭টি অঞ্চলের কর্মী নেতৃত্ব সহ কলকাতার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির নেতৃত্ব ও বিভিন্ন সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক মনোজ সাউ।

রক্তদান কর্মসূচীর প্রারম্ভে অরবিন্দ সভাকক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য। এদিনের কর্মসূচীর উদ্বোধন করে বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা দেবদূত ঘোষ বলেন, রাজ্য সরকারী

রক্তদান করছেন কর্মচারীবন্ধুরা

কর্মচারীদের আন্দোলনে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি একটি স্থায়ী ফলক, অনেক লড়াই

● দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার পঞ্চাশতম বর্ষ উদ্‌যাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার পথ চলা শুরু ১৯৭১ সালে। ঐ বছর ৭ মে রবীন্দ্র

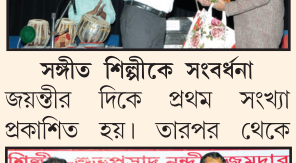

সঙ্গীত শিল্পীকে সংবর্ধনা

জয়ন্তীর দিকে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে

সঙ্গীতে শুভপ্রসাদ নন্দী মজুদার

মাসিক প্রকাশনা ঘটেছে ধারাবাহিকভাবেই। মাঝে শুধু জরুরি অবস্থাকালীন (১৯৭৫) দশ মাস এই মাসিক পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ ছিল। তারপর থেকে নিয়মিত

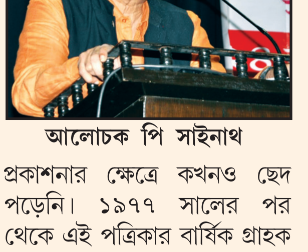

আলোচক পি সাইনাথ

প্রকাশনার ক্ষেত্রে কখনও ছেদ পড়েনি। ১৯৭৭ সালের পর থেকে এই পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক সংখ্যাক ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে তা দু'লক্ষাধিকে পৌঁছোয়। ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ট্রেড ইউনিয়ন মুখপত্রের শিরোপাও পায় সংগ্রামী হাতিয়ার। ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্যের নেতিবাচক পরিবর্তনের পরে গ্রাহক সংখ্যার কিছুটা হ্রাস ঘটলেও, সংগ্রামী হাতিয়ার তার দায়িত্ব প্রতিপালনে কখনও হতোদ্যম হয়নি। রাজ্য সরকারী কর্মচারী সহ সমাজের সর্বস্তরের মেহনতী মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কম্বুকণ্ঠে সোচ্চার

আলোচককে সংবর্ধনা

থেকেছে বরাবর। নয়া উদারবাদী

● চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সম্পাদকীয়

আমরা ফিরছি আমাদের প্রকৃত পরিচয়ে

স্বাধীনতা উত্তরপর্বে রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের কোনো গবেষণামূলক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এযাবৎ রচনা করা সম্ভব হয়নি। মূলত স্মৃতিনির্ভর কিছু বিক্ষিপ্ত প্রয়াসের মাধ্যমে তৎকালীন সময়ের কিছু খণ্ড চিত্র কর্মচারী আন্দোলনের চৌহদ্দির মধ্যেই থাকা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। খণ্ড হলেও, বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তর দশকের উত্তাল কর্মচারী আন্দোলনের উত্তাপ অনুভব করার ক্ষেত্রে সেগুলি যথেষ্ট। সমগ্র বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্দাম খরস্রোতের ধারায়, দুর্দমনীয় বেগে ধাবমান মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের আন্দোলনও ছিল স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল।

সেই সময়কার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বহন করে যাঁরা এখনও জীবিত এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খণ্ড ইতিহাসের তন্বিষ্ট পাঠক যাঁরা—এঁরা সকলেই মাঝে মধ্যেই গলায় কিছুটা অনুযোগের সুর এনে বলেন, ‘তেমন আন্দোলন তো আর হচ্ছে না।’ অথবা এমনও বলেন, ‘কোথায় সেই হার না মানা জেদ, আবেগ ও স্বতঃস্ফূর্ততা?’

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অতীত ইতিহাসকে উত্তম মাত্রায় আত্মস্থ করে এবং তার ভিত্তিতে কর্মচারী আন্দোলনের রূপ কেমন হওয়া আকাঙ্ক্ষিত, তার একটা ছবি মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে যাঁরা এই অনুযোগটুকু করেন, তাঁরা সকলেই চান রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলন তথা মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনে ষাট বা সত্তর দশকের উদ্দামতা ফিরে আসুক। একান্ত শুভানুধ্যায়ী বলেই তাঁরা এমনটা চান, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আবার, শুধু তাঁরা চান বলেই নয়, স্বৈরাচারী শাসকের নিষ্ঠুরতা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করে জয় ছিনিয়ে আনতে হলে, উত্তাল আন্দোলন ব্যতিরেকে কোনো পথও তো নেই। সময়, পরিস্থিতির যতই পরিবর্তন ঘটুক না কেন, উত্তাল আন্দোলনের অনিবার্যতা শাশ্বত সত্য।

তাহলে প্রশ্ন, উত্তাল আন্দোলন নিয়ে কিছুটা হা-হুতাশের এই জমিটা তৈরি হল কেন? এটা কি বর্তমান প্রজন্মের নেতৃত্বের দক্ষতা, যোগ্যতা ও আন্তরিকতার বা দায়বদ্ধতার ঘাটতির ফল? না কি এর পিছনে অন্য এক বা একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, চলমান ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য হলেও, কোনো ব্যক্তিই স্বয়ম্ভূ নন। তিনি সময়সাময়িক পরিস্থিতির বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের ফসল। দ্বিতীয়ত, সংগঠিত আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এখানে একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে (যেমন মধ্যবিত্ত কর্মচারী) সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে যখন প্রজন্মান্তর ঘটে তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রজন্মন্তর ঘটে নেতৃত্ব প্রদানকারী অংশের মধ্যেও। এখানেও নেতৃত্বের ব্যাটন হস্তান্তরিত হয় ঠিকই, কিন্তু তা রিলে রেসের ব্যাটন হস্তান্তরের মতো নয়। অর্থাৎ একজন যখন ছুটছেন, তখন অপরজন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ব্যাটনটা হাতে পাওয়ার অপেক্ষায়। একমাত্র ব্যাটনটা হাতে এলেই তিনি ছুটতে শুরু করতে পারেন, আর তাঁর আগে যিনি দৌড়োচ্ছিলেন তিনি তখন থেমে যান, তাঁর দৌড় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ঠিক এই পদ্ধতিতে নেতৃত্বের ব্যাটন হস্তান্তরিত হয় না। রিলে রেসে যাঁরা দৌড়োন, তাঁরা সকলেই সমঅবস্থানে থাকেন। কিন্তু সংগঠিত আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানে স্তরভেদ থাকে। সর্বোচ্চ স্তরে যাঁরা নেতৃত্ব দেন, তাঁদের হাত থেকে ব্যাটনটা আসে নিম্নতর স্তরে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের হাতে। অর্থাৎ তাঁরা তখন সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হন। কিন্তু এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া হয় পর্যায়ক্রমে। একসাথে পুরনো নেতৃত্ব সবাই সরে গেলেন, আর সম্পূর্ণ নতুন এক ঝাঁক নেতা এসে তাঁদের জায়গা পূরণ করলেন এমনটা হয় না। ফলে দুই প্রজন্মের একসাথে কাজ করার মধ্য দিয়ে, প্রবীণতর অংশের অভিজ্ঞতা সহ নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী থেকে শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ পান নবীনতর অংশ। স্বভাবতই নেতৃত্বের গুণাবলীর যে মানদণ্ড তার নিরিখে নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা বা দক্ষতা কোনো এক বিশেষ প্রজন্মের মধ্যেই আবির্ভূত হয় এবং তাঁদের সাথেই অন্তর্হিত হয়, এমন ধারণা অবৈজ্ঞানিক। গুণাবলী সঞ্চারিত হয় এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে। তাই নেতৃত্বের দক্ষতা ও যোগ্যতা বা দায়বদ্ধতার প্রকারভেদের কারণেই বর্তমান সময়ের আন্দোলন-সংগ্রাম ষাট বা সত্তর দশকের মতো দানা বাঁধছে না—এই ধরনের ভাবনা অতি সরলীকরণের দোষে দুষ্ট। আসলে সমস্যাটা নিহিত রয়েছে পরিস্থিতির মধ্যেই।

যদিও মোটা দাগে বুঝতে গেলে মনে হবে আলোচ্য দুটি সময়ের পরিস্থিতিই যেহেতু কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষের স্বার্থের নিরিখে প্রতিকূল, তাই আন্দোলন সংগ্রামও সর্বার্থে সমভেদগতি সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন যে রয়েছে, এটা যথার্থ। কিন্তু মূল সমস্যা হল কেন হচ্ছে না। এই ‘কেন’-র উত্তর পেতে হলেই প্রতিকূলতার চারিত্রিক ভিন্নতাকে খুঁজে দেখা দরকার। আবার শুধু প্রতিকূলতার বিভিন্নতাই নয়, যাঁদের নিয়ে আন্দোলন, সেই মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের অবস্থানেরও যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে, তাও বিবেচনার মধ্যে রাখা প্রয়োজন।

পঞ্চাশ থেকে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যে উত্তাল আন্দোলনের রেফারেন্স প্রায়শই আলোচনায় চলে আসে, সেই সময় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন-ভাতার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ হতশ্রী। সামাজিক অবস্থান ছিল অধিকারহীন এক ‘ভার্নারেবল’ গোষ্ঠী। উপরন্তু, এঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ ছিলেন দেশভাগের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট ‘ছিন্নমূল’ জনগোষ্ঠী। স্বভাবতই কোনো কিছুই না পাওয়া এবং না থাকার যন্ত্রণা তৎকালীন সময়ের কর্মচারী আন্দোলনের মজ্জায় ক্ষোভের আগুন সহজেই প্রজ্জ্বলিত করতে সক্ষম হয়েছিল। বৃহত্তর পরিসরেও তখন সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা, সংবিধান নির্দেশিত ‘জনকল্যাণকামী’ রাষ্ট্রের জনকল্যাণসাধনে চূড়ান্ত অনীহা, জনহিতের পরিবর্তে জনঅনিষ্ট সাধনে তৎকালীন শাসকের তৎপরতা, প্রতিহিংসামূলক প্রশাসনিক নিয়মবিধি প্রভৃতির প্রতিস্পর্ধায় জন্ম নিয়েছিল গণআন্দোলনের ‘ভিসুভিয়াস’। ঐ ভিসুভিয়াসের থেকে নিঃসৃত শাসক বিরোধী ক্ষোভের উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছিল কর্মচারী আন্দোলনের বৃত্তেও।

গণআন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ শীর্ষেই সত্তরের দশকের প্রায় শেষভাগে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুস্থিত পরিবেশ। গণতন্ত্রের সুবাতাস বইতে শুরু করেছিল আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের দরজা ও জানালা দিয়ে। রাজ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্যের জনমুখীন পরিবর্তন রাজ্য কর্মচারীদের জীবিকা ও জীবিকানির্ভর জীবনে এনেদিল বিপুল ইতিবাচক পরিবর্তন। এই সময়টা (সত্তরের দশকের শেষভাগ থেকে আশির দশকের মধ্যভাগ) ছিল প্রশাসনের অভ্যন্তরে প্রজন্মান্তরের সময়ও। ফলত যাঁদের ঘাম আর রক্তের (আক্ষরিক অর্থেই) ফসল ছিল সোনালী দিনের আগমন, তাঁরা কিন্তু তার সুফল খুব বেশি দিন ভোগ করার সুযোগ পেলেন না। নবীন প্রজন্ম, যাঁদের প্রতিকূল পরিস্থিতি আর প্রতিহিংসামূলক প্রশাসনের ঘাত-প্রতিঘাতকে মোকাবিলা করতে হয়নি, বরং আপাত নিস্তরঙ্গ গণতান্ত্রিক বাতাবরণে কর্মজীবন শুরু করার সুযোগ পেলেন, সাফল্যের বারিধারায় স্নাত হলেন তাঁরাই। এদের বড় অংশই সংগঠন-আন্দোলনে যুক্ত হলেন, প্রয়োজনীয় পারদর্শিতাও অর্জন করলেন, কিন্তু প্রতিকূলতাজনিত ত্যাগ ও তিতিক্ষার আগুনে অভিজ্ঞতাকে সেঁকে নেওয়ার সুযোগ পেলেন না।

নিঃশঙ্কায় বহমান এই জীবনে নব্বই দশক থেকে নয়া উদারবাদজনিত ভোগমুখী প্রসাধনী পলেস্তারা জমতে শুরু করল। ফলত, সংগঠন-আন্দোলনের বাহ্যিক অবয়বের ধারাবাহিক বৃদ্ধি ঘটলেও, অন্তর্বস্তুতে আত্মত্যাগের মানসিকতা, সাহস ইত্যাদি গুণাবলীর স্রোতে যে ভাঁটা পড়ছে, তা সংঘর্ষহীন পরিস্থিতির কারণেই ধরা পড়েনি।

স্বভাবতই প্রতিকূলতার পুনরাবির্ভাবের যে ধাক্কা তা সামলাতে অনভিজ্ঞতাজনিত কারণেই বেশ কিছুটা সময় লেগেছে। আবার প্রতিকূলতার চারিত্রিক ভিন্নতার কারণেই, অতীত অভিজ্ঞতার পুঁথিলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে চটজলদি সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পরিস্থিতির বিভিন্নতা, সময়ের সাথে বহমান চাপান-উতোর এবং যথাক্রমে অনুকূল ও প্রতিকূল জোয়ার-ভাঁটার মধ্যেও একটি বৈশিষ্ট রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাংগঠনিক ধমনীর শোণিত প্রবাহ। তা হল, হার না মানা মনোভাব। মেহনতী জনগণের স্বার্থ সাপেক্ষে সৃষ্ট মতাদর্শের প্রতি অবিচল অবস্থাই এই অদম্য মানসিকতার উৎস। একে ভিত্তি করেই, বিভিন্ন কর্মচারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে সংগঠন-আন্দোলন-ঐক্য ও চেতনাকে পুষ্ট করার নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম গ্রহণে কোনো শিথীলতা প্রদর্শিত হয়নি কখনোই। সর্বক্ষেত্রে আশানুপরূপ ফল না পাওয়া গেলেও, ‘চরৈবেতি’ মন্ত্রে ছেদ পড়েনি একেবারেও। ‘মা ফলেষু কদাচন’ এই ভাববাদী শিক্ষার বিপ্রতীপে অধ্যবসায় ও শ্রমের ফল মিলবেই—বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন এই বিশ্বাসে বলীয়ান হয়েই সংগঠন তার গতিশীলতাকে অব্যাহত রেখেছে।

প্রতিকূলতা যতই ডানা ঝাপটে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি করতে চাক না কেন, আহত অভিজ্ঞতার কাঁচি একসময় সেই ডানা ছাঁটতে শুরু করে। সেই ডানা ছাঁটার কাজটা শুরু হয়েছে। যার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে কর্মচারী আন্দোলনের বৃত্তেও। ধীর লয়ে একটা পরিমাণগত পরিবর্তন যে ঘটতে শুরু করেছে তার কিছুটা বিভিন্ন কর্মসূচীতে আঁচ পাওয়া গেলেও খালি চোখে সবটা ধরা পড়ছিল না। ধরাটা পড়ল যখন অনেকটাই গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেলে। ২০-২১ মে কয়েক হাজার কর্মচারীর রাজপথে রাতজাগা ছিল গুণগত পরিবর্তনমূলক এক মাইল ফলকের কর্মসূচী। প্রতিহিংসাপরায়ণ, অত্যাচারী শাসকের রোষানল থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই বহু কর্মচারী বন্ধু ‘পরিবর্তন’-এর শুরু থেকেই নিজেদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখলেও, মনের কোণে সংগঠনের জন্য জমে থাকা ভালোবাসা ও আবেগ যে এতটুকুও শুকিয়ে যায়নি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল ২০-২১ মে। গভীর রাতের কলকাতা প্রত্যক্ষ করল প্রশাসনের শীর্ষবিন্দু থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙে দেওয়ার ‘হুমকি’-কে ‘হুক’ করে ছক্কা হাঁকিয়েছেন দৃঢ়বদ্ধ কর্মচারী সমাজ।

সারা রাতব্যাপী অবস্থান কর্মসূচী জানান দিল প্রতিকূলতাকে ভেদ করে সংঘশক্তি ক্রমবর্ধমান। অতঃকিম? এর উত্তর ট্রেড ইউনিয়ন ‘টেক্সাট বুক’-এই রয়েছে। যা বিংশ শতাব্দীর ষাটের বা সত্তরের দশকেও ছিল প্রযোজ্য, একবিংশ শতাব্দীর বিশের দশকেও একইভাবে প্রযোজ্য। নিজ সংঘশক্তির বৃদ্ধি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরের ধাপ হল, বৃত্তটাকে বড় করা, আর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচীর দিকে অগ্রসর হওয়া। এই পথেই এল ২৫টি সংগঠনকে নিয়ে যৌথমঞ্চ গড়ে তোলা, আর যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বে ৩০ আগস্ট দু'ঘণ্টার কর্মবিরতি তথা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচী। যে স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে হাজার হাজার কর্মচারী এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করলেন, তা সংগঠনের আগাম অ্যাসেসমেন্টকেও ছাপিয়ে গেল। বুক চিতিয়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে কর্মচারীবন্ধুরা কর্মবিরতিতে অংশ নিলেন। নিজেদের ‘আইডেনটিটিকে’ আড়াল করার এতটুকু চেষ্টাও করলেন না। বোঝা গেল, ভয়ের কারা টুটছে। সাহসের ঢেউ উঠছে। হ্যাঁ, একই সময়ে সর্বাঙ্গে দুর্নীতির পাঁক মাখা শাসকের ঘৃণ্য রাজনীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলনও বর্ধিত উদ্দীপনা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। ঠিক যেন অসংখ্য শিল্পী অসীম অধ্যবসায়ে অনেকাংশেই ভিন্ন এক ফ্রেমে ষাট আর সত্তর দশকের উত্তাল বাংলার প্রতিবিম্ব নির্মাণ করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। পশ্চিমবাংলার গণআন্দোলন ফিরছে স্বমহিমায়, আমরাও ফিরছি আমাদের প্রকৃত পরিচয়ে। □

১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

রক্তদান এবং মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদানের অঙ্গীকার কর্মসূচী

সংগ্রামের সংগঠক। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষা ছাড়াও এই সংগঠন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও নানা সমস্যায় সাধারণ মানুষের পাশেও বারবার দাঁড়িয়েছে। এখনও তারা রাজ্যে বর্তমান সরকারের নানা দানবীয় অত্যাচারের মোকাবিলা করতে করতেই এগিয়ে চলেছে।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করার কারণে সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে প্রতিহিংসামূলক ভাবে দূরদূরান্তে বদলী, মিথ্যা মামলা দিয়ে এখনও হয়রান করা হচ্ছে। তবু সংগঠন তার সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে সরে যায়নি। এটা সকলের কাছেই গর্বের বিষয়, চলার পথে প্রেরণা। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ ও সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য রক্তদাতা এবং একই সঙ্গে চক্ষুদান ও মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করতে এগিয়ে আসার জন্য উপস্থিত

অপেক্ষমান রক্তদাতারা

সকলকে অভিনন্দন জানান। কুর্ণিশ জানান অংশগ্রহণকারীদের। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজয় শঙ্কর সিংহ বলেন, এই বছর আজকের দিন ১৪ জুলাই পর্যন্ত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে জেলায় জেলায় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলির উদ্যোগে বেশ কিছু রাক্তদান শিবির সংগঠিত হয়েছে। এক হাজারের বেশি সদস্য বন্ধুরা ইতিমধ্যে সেই শিবিরগুলিতে রক্তদান করেছেন। সামাজিক দায়বদ্ধতার এই কর্মসূচী সারা বছর ধরেই অব্যাহত থাকবে কারণ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি শুধুমাত্র কর্মচারীদের দাবি নিয়েই লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করে না, সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে রক্তদান, চক্ষুদান এবং মরণোত্তর দেহ দানের মতো সামাজিক আন্দোলনের কর্মসূচীও সফল করতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্মী-নেতৃত্বরা সমানভাবে আন্তরিকতার সাথে প্রয়াস জারি রেখেছেন, ভবিষ্যতেও রাখবেন। □

দেবাশীষ রায়

রাজ্য সরকারের মিথ্যাচারিতার জবাব দেবে রাস্তার আন্দোলন

এতদিন এই রাজ্যে সরকারটা চলছিল মিথ্যা ভাষণ, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও মিথ্যা পরিসংখ্যানের ওপর। এখন মিথ্যার বেসাতি আদালতের দরজাতেও কড়া নাড়তে শুরু করেছে। আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে জনগণের করের টাকায় গড়ে ওঠা সরকারী কোষাগারের টাকা বিভিন্ন ক্লাবকে যথেচ্ছ বিলোনোর ন্যায্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। এই মামলায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে হলফনামা জমা দেওয়া হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, সরকারী কর্মীদের কোনো ডিএ বকেয়া নেই। জনগণের সামনে ভুরি ভুরি মিথ্যা ভাষণ আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বিলোনোয় পারদর্শী এই সরকারের মিথ্যাচারিতার স্পর্ধা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে হলফনামা দিয়ে মিথ্যা বলতেও এঁদের হাত কাঁপে না। অথচ এই ন্যায়ালয়েরই সরকারী কর্মীদের বকেয়া ডিএ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেওয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে। রাজ্য সরকার আবার সেই আদেশনামার পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে একটি হলফনামা দাখিল করেছে। অর্থাৎ একই সরকার একই আদালতে দুটি পৃথক মামলায় পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পেশ করল। দেশের সংবিধানের প্রতি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা থাকলে এই ধরনের নির্জলা মিথ্যা উগড়ে দেওয়া কোনো সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়।

ডিএ সংক্রান্ত মামলা আদালতে চলাকালিন এবং ঐ মামলার চূড়ান্ত রায় প্রকাশের পরেও, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বার বার একটা কথা জোরের সাথেই বলেছে, স্বৈরাচারী কায়দায় পরিচালিত কোনো সরকারের প্রকোপ থেকে অর্জিত অধিকারকে রক্ষা করতে হলে রাস্তার লড়াইকেও জারি রাখতে হবে। আইনি লড়াইয়ে জয় যেমন অধিকারের স্বীকৃতি, তেমনই সেই স্বীকৃতির বাস্তবায়ন সম্ভব ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে। এই লক্ষ্যেই গত ২০-২১ মে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে রাত্রিব্যাপী গণঅবস্থানে শামিল হয়েছিলেন কয়েক হাজার কর্মচারী। গত ৩০ আগস্ট রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ ২৫টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চের ডাকে সারা রাজ্যে পালিত হয়েছে দু'ঘণ্টার কর্মবিরতি। এছাড়াও প্রতিপালিত হয়েছে বেশ কিছু বিক্ষোভ কর্মসূচী। প্রতিটি কর্মসূচী প্রমাণ করেছে সরকারী কর্মচারী সহ সংশ্লিষ্ট সকলেই ক্ষোভে ফুটছেন। সুতরাং রাজ্য সরকার মিথ্যাচারিতার রাস্তা থেকে সরে না এলে আগামী দিনে এই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটবেই। রাজ্য সরকারের প্রতি এটা হুঁশিয়ারি। ৮ সেপ্টেম্বর সারা রাজ্যে টিফিন বিরতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিক্ষোভ কর্মসূচী। এই কর্মসূচী ছিল সরকারী কর্মীদের প্রতিবাদের বজ্র নির্ঘোষ।

সরকারী কর্মীরা রাজপথে, মিথ্যাচারী সরকার হুঁশিয়ার! □

রাজ্য কাউন্সিলের পঞ্চম সভার আহ্বান

সংগঠনের সর্বস্তরে সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে

দেশের আরএসএস-বিজেপি সরকারের নয়া উদারনীতির প্রয়োগে স্বৈরাচারী পদক্ষেপ ও বহুমাত্রিক সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে সর্বত্র সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি রাজ্যে সরকারের একাধিক দুর্নীতি, নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে এবং বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান সহ অর্জিত অধিকার রক্ষার দাবিতে সরাসরি সংঘর্ষে যাওয়ার লক্ষেও সর্বত্র প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে। ২০-২১ মে, ২০২২ সারা রাত ব্যাপী কলকাতার রাজপথে কেন্দ্রীয়ভাবে গণ অবস্থানের কর্মসূচী সংগ্রামী প্রতিবাদী মেজাজ ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে হাজার হাজার কর্মচারীর জমায়েত ও সারারাত ব্যাপী অবস্থানের মধ্য দিয়ে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্যকে সাংগঠনিকভাবে সংহত করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করে ধারাবাহিকভাবে লড়াই সংগ্রাম জারি রাখতে হবে। আসন্ন বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে সংগঠনের সর্বস্তরে সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে---রাজ্য কাউন্সিলের পঞ্চম সভায় এই আহ্বানকে কার্যকর করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষিত হয়।

প্রস্তাবনা পেশ করছেন বিজয় শংকর সিংহ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য কাউন্সিলের পঞ্চম সভা বিগত ২৩-২৪ জুলাই ২০২২ কলকাতার কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারীভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিনের রাজ্য কাউন্সিল সভায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য এবং সহ-সভাপতিত্রয় প্রশান্ত সাহা, গীতা দে ও মানস দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করে। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন আশীষ ভট্টাচার্য এবং পরবর্তীতে নীরবতা পালন করা হয়।

সভায় প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা পেশ করতে গিয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ বলেন বিগত ১৯ জুলাই, ২০২২ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা যেমন করা হয়েছে একইরকমভাবে আগামী কর্মসূচীর কিছু রূপরেখাও নির্দিষ্টকরণ করা হয়েছে। এক ভয়ঙ্কর দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে দেশের শ্রমজীবী মেহনতী জনগণ দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। কোভিড মহামারি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে বেআব্রু করে দিয়েছে। ১০ শতাংশ মানুষ শোষণ করে চলেছে ৯০ শতাংশ মানুষকে।

সমগ্র দেশজুড়েই শ্রমজীবী মেহনতী প্রতিদিন কাজ হারাচ্ছেন আর কর্পোরেটদের সম্পদের পাহাড় আকাশচুম্বী হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে লড়াইও তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। লাতিন আমেরিকায় একের পর এক দেশ বামপন্থায় আস্থা রাখছে, সর্বশেষ কলম্বিয়ার মতো দেশের মানুষও ভরসা রাখলেন বামপন্থায়। আমাদের উপমহাদেশের এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। মানুষ অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন। রাষ্ট্রপতিভবন দখল হয়েছে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে বিপদ একের পর এক আইনের মধ্য দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এর বিরুদ্ধে সংসদ বহির্ভূত আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই সংসদ বহির্ভূত আন্দোলনই শেষ কথা বলবে। যেমন শেষ কথা বলেছে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন। দু কোটি বেকারের বছরে চাকরি, প্রতি অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে চরম দক্ষিণপন্থীরা কেন্দ্রে সরকার গড়ার মধ্য দিয়ে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতীর ওপর তীব্র আক্রমণ ও নিপীড়ন নামিয়ে এনেছে। এর বিরুদ্ধে কৃষকরা যেমন লাগাতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল থেকেছেন; শ্রমিকরাও ২৮-২৯ মার্চ ২০২২-এর ঐতিহাসিক ধর্মঘট সংগঠিত করেছেন। ধর্মঘটের ১২ দফা দাবি, প্রতিটি দরিদ্র পরিবারকে মাসিক ৭৫০০ টাকার দাবি ছিল অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কিন্তু এই সরকার জনকল্যাণমুখী পদক্ষেপ নেওয়া তো দূর অস্ত খাদ্যদ্রব্যের ওপর জি এস টি চাপিয়ে দিচ্ছে। কর্পোরেটদের ট্যাক্স ৩০ শতাংশ থেকে কমে ২২ শতাংশ হচ্ছে। কোথাও ১৫ শতাংশ, অপরদিকে পরোক্ষ কর চাপিয়ে পুরো চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে সাধারণ মানুষের ওপর। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে প্রতিদিন আমার দেশ তলিয়ে যাচ্ছে। মানুষ ন্যূনতম ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করতে পারছে না। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে গণতন্ত্র লঙ্ঘিত হলে বিকাশ হতে পারে না। এর বিরুদ্ধে লড়াই সংগঠিত হবে। সাম্প্রতিক সময়ে জুবেইর, তিস্তা শীতলাবাদের ঘটনা সরকারের মুখোশ খুলে দিয়েছে। এর জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের সরকার ভর্ৎসিত হচ্ছেন। এর বিরুদ্ধে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সর্বশেষ জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা (তুতিকোরণ) থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামীর বৃহত্তর লড়াইয়ের প্রস্তুতি গড়ে তোলার। দেশের ক্ষেত্রে বাম-গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ঐক্যবদ্ধ হতে চেষ্টা করছে। আমাদের রাজ্যেও গণতন্ত্র প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত আক্রান্ত। এর বিরুদ্ধে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি লড়াই করছে। আমরাও প্রশাসনের অভ্যন্তরে আক্রান্ত, আক্রান্ত অর্থনৈতিকভাবে। ৩১ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া। এর থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে বিভিন্ন মাধ্যমকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। দেশের সরকারের মতোই আমাদের রাজ্য সরকারও নয়া উদারবাদী অর্থনীতির সমর্থক। দেশের সরকার বীমা, এলআইসি, রেল বিক্রি করছে আর আমাদের রাজ্যেও শতাব্দী প্রাচীন বিজি প্রেস বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। সামাজিক খাতে ব্যয় কমানো হচ্ছে, রেশন দুর্নীতি চলছে। মিউনিসিপ্যালিটি অঞ্চলগুলিতে দুর্নীতির প্রতিযোগিতা চলছে। আমরা পরিষ্কার বলতে চাই ভিশা নয়, কর্মসংস্থান চাই। গোটা রাজ্য কোষাগার থেকে বেতপ্রাপ্ত প্রায় ৬ লক্ষাধিক শূন্যপদে স্বচ্ছতার সঙ্গে দ্রুত নিয়োগ চাই। শিক্ষক নিয়োগ সহ সমস্ত ক্ষেত্রে দুর্নীতির অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এবং এর জন্য দোষীদের কড়া শাস্তি দিতে হবে। আমাদের রাজ্যে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালেই শুধু নয় তার আগের ৩০ বছরেও একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতি ছিল, আজকের মতো লুম্পেনরাজ ছিল না। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সাম্প্রদায়িক বহুমাত্রিক বিভাজনের রাজনীতি। এগুলির বিরুদ্ধে আমাদের প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। মধ্যবিত্ত কর্মচারী অংশ হিসাবে আমরা আমাদের দায় এড়াতে পারি না। বাইরের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ছাত্র-যুব-মহিলা কৃষকদের আন্দোলন, মধ্যবিত্ত কর্মচারী সংগঠনের আন্দোলনকে একযোগে ঝাঁপাতে হবে। বেকারদের চাকরির দাবিতে, শূন্যপদে অবিলম্বে স্বচ্ছতার সঙ্গে লোক নিয়োগের দাবিতে, সাম্প্রদায়িক আক্রমণের বিরুদ্ধে, নয়া উদার আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে, লুম্পেনরাজ বন্ধ করার দাবিতে আমাদের বৃত্তকে আরও বড় করে আগামীর লড়াইতে যেতে হবে।

বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন বিগত ১৩-১৬ এপ্রিল ২০২২ সর্বভারতীয় ফেডারেশনের ১৭তম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিহারের বেগুসরাইতে। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে ২৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ১৮-২২ এপ্রিল ২০২২ কেন্দ্রীয়ভাবে সব জেলায় ব্লক স্তর পর্যন্ত সফরের কর্মসূচী হয় ৭০ জন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসের কর্মসূচী কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মচারী ভবনে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয় ১ মে ২০২২। অনুরূপভাবে সমিতি ও জেলাগুলিতে এই কর্মসূচী প্রতিপালন করা হয়। ১৫ মে ২০২২ বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে জলপাইগুড়ি জেলায় অভ্যর্থনা কমিটির গঠনের সভা সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে দান মেলা কার্যত 'দায়বদ্ধতার মেলায়' রূপান্তরিত হয়। ১৬-১৯ মে ২০২২ চারদিন ব্যাপী সারা রাজ্যজুড়ে ২০-২১ মে ২০২২-এর রাতজাগা কর্মসূচীর প্রাক প্রস্তুতিমূলক প্রচার কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। ২০-২১ মে ২০২২ কেন্দ্রীয়ভাবে ৫ দফা দাবিতে কলকাতার রাজপথে সারা রাত ব্যাপী অবস্থান কর্মসূচী কয়েক হাজার কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্তদের উপস্থিতিতে ব্যাপক সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০০০-এর বেশি কর্মচারী / পেনশনার্সদের রাতজাগা সংগঠনের

জবাবী ভাষণ দিচ্ছেন বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৪ ঘণ্টার বেশি সাংস্কৃতিক কর্মসূচী স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে সংগঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতিকে অভিনন্দন। তারা যেভাবে এই কর্মসূচী সফল করতে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। আমাদের এই সাফল্যকে সংহত করে এগোতে হবে। কর্মীকে নেতৃত্বের ...... উত্তোরণ করতে হবে । রাতজাগা কর্মসূচীর মঞ্চ থেকেই আহুত গোটা রাজ্যজুড়ে ব্লক স্তর পর্যন্ত বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদানের দাবিতে টিফিনের সময় কর্মচারী জমায়েদের মধ্য দিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচী ২৩-২৭ মে ২০২২ প্রতিপালিত হয়। ১২ই জুলাই কমিটির নবম রাজ্য সাংগঠনিক কনভেনশন কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ২২ জুন ২০২২ সর্বভারতীয় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার এবং কোষাধ্যক্ষ সহ শশীকান্ত রায়ের উপস্থিতিতে কর্মচারী ভবনে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রয়াত কমরেড সুকোমল সেনের আবক্ষ মূর্তি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের হাতে তুলে দেওয়া হয় সর্বভারতীয় ফেডারেশনের নবগঠিত কেন্দ্রীয় দপ্তরে স্থাপন করার জন্য। ১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ১২ জুলাই ২০২২ ধর্মতলার লেনিন মূর্তির

● নবম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন সমূহ, ব্যাঙ্ক, বিমা, বিএসএনএল ও ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে ৬ দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় জমায়েত ও মিছিল

সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্প ভিত্তিক ফেডারেশন সমূহ ব্যাঙ্ক, বিমা, বি এস এন এল ও ১২ই জুলাই কমিটির ডাকে কলকাতায় লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত এক প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিল সংগঠিত হয় বিগত ২ আগস্ট ২০২২ মঙ্গলবার। বিকাল ৫টায় লেনিন মূর্তির পাদদেশে উপস্থিত শ্রমজীবী মানুষের সমাবেশে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনাদি সাহু বলেন একদিকে যখন অসংখ্য পরীক্ষার্থীদের মলিন মুখগুলি চাকরির সন্ধানে অপেক্ষামান রয়েছে, অন্যদিকে তখন কোটি কোটি টাকার বেআইনি ধনসম্পদ জমিয়ে উল্লাসে মত্ত রয়েছে বর্তমান রাজ্যের শাসকদল। এই সমস্ত বেআইনী ধনসম্পদের সমস্ত হিসেব নিকেশ কালীঘাটেই রয়েছে। এই তোলাবাজি, গুণ্ডাবাজির বিরুদ্ধে যেমন প্রতিবাদ আরও জোরালো হবে, তেমনই সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগের দাবিতেও আরও সোচ্চার হবেন মানুষ। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন এবং গণসংগঠনগুলি বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। একই সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যায়ভাবে প্রতিটি জিনিসের ওপর বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের ওপর জি এস টি চাপানোর বিরুদ্ধেও। সংক্ষিপ্ত সভায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এ আই সি সি টি ইউ নেতৃত্ব অতনু চক্রবর্তী, টি ইউ সি সি নেতৃত্ব আশিষ পাণ্ডে, এ আই টি ইউ সি নেতৃত্ব বাসুদেব গুপ্ত, ইউ টি ইউ সি নেতা দীপক সাহা প্রমুখ। বক্তারা বলেন প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি রাজ্যকে কোথায় টেনে নামিয়েছে তা সবাই দেখছেন। এই বৃহত্তর কেলেঙ্কারির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের উপযুক্ত শাস্তি না হলে অন্যায়ের সঠিক বিচার হবে না। গত ১১ বছর ধরে রাজ্যে যখন এই দুর্নীতি চলছে, তখন কেন্দ্রীয় সরকার এক এক করে লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা বিক্রি করে দিচ্ছে কর্পোরেটদেরকে। আম্বানি-আদানি সহ এরকমই আরও দু-চারটে পরিবার নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ'র পরম বন্ধু যাদের হাতে দেশের সম্পদগুলি উপহার দিয়ে চলেছে রীতিমতো সরকারী কাগজপত্রের মাধ্যমে। অপরদিকে সাধারণ মানুষ নাজেহাল হচ্ছেন দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির কারণে। জি এস টি নামক একটি ফাঁদ বা জাল নেমে এসেছে প্রতিটি পরিবারের ওপর। ফলস্বরূপ সেই জালে জড়িয়ে পকেট ক্রমশ খালি হতে হতে রীতিমতো ধার দেনায় ডুবে যাচ্ছেন মানুষ। এই পরিস্থিতিতে আগামীদিনে আরও জোরদার আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। সংক্ষিপ্ত সমাবেশের পরবর্তীতে মিছিলের শুরুতেই রক্তপতাকা, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড আর ব্যানারে ঢেকে যায় কলকাতার প্রাণকেন্দ্র। মুহুর্মুহু স্লোগানে উত্তাল মিছিল লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে যায় কলেজ স্কোয়ার অভিমুখে। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি বন্ধ করে অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হন মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা। একই সঙ্গে টেট, এসএসসি উত্তীর্ণদের চাকরি, অবিলম্বে রাজ্য সরকারের সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগের দাবি ওঠে এদিনের মিছিল থেকে। দাবি ওঠে খাদ্য সামগ্রীর ওপর থেকে জি এস টি প্রত্যাহার এবং সমস্ত জিনিসপত্রের দাম কমানোর। এদিনের মিছিল ও সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ হুঁশিয়ারী দেন প্রতিবাদ হচ্ছে, আরও হবে। রাজ্যজুড়ে প্রতিটি মানুষই প্রতিদিন ক্রমাগত সোচ্চার হবেন রাজ্যের শাসকদলের টাকা চুরি নিয়ে। প্রয়োজনে কালীঘাটে তদন্ত করতে হবে। সমস্যার সমাধান না হলে আরও তীব্র আন্দোলনে উত্তাল হবে রাজ্য, গোটা দেশ। সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধানে অবিলম্বে সরকার পরিবর্তন আবশ্যক। সর্বপ্রথম দুর্নীতিবাজ তৃণমূলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে তীব্র লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আর তৃণমূলকে মদত দেওয়া বিজেপি সরকার যাতে একটাও আসন এ রাজ্যে না পায় সেই শপথও নিতে হবে আমাদের। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা লুঠ করে তৃণমূল যে স্বপ্ন দেখছে তাকে ধূলিসাৎ করতে হবে। গোপন সেটিং করে তৃণমূলের রক্ষা পাওয়ার পথ বন্ধ করতে হবে। তার জন্য তৃণমূল এবং বিজেপির নেতাদের মুখোশ টেনে খুলে দিতে হবে। গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছাতে হবে জোরদারভাবে। □

দেবাশীষ রায়

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

৫০তম বর্ষ উদ্‌যাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

অর্থনীতির পর্বে কর্পোরেট পুঁজির বিপুল শক্তিতে বলীয়ান মেইন স্ট্রীম মিডিয়ার চোখ ধাঁধানো 'উত্তর সত্য' প্রচারকে মোকাবিলায় তন্নিষ্ঠ থেকেছে। ১৯৭৯ সালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ষষ্ঠ রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সংগ্রামী হাতিয়ারের প্রথম বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে প্রতিটি রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষেই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও সংগঠনের রজত জয়ন্তী (১৯৮১) এবং সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ (২০০৬) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যেও বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ করা হয়। মাসিক প্রকাশনাগুলিতে পত্রিকার এডিটোরিয়াল বোর্ডে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে যুক্ত থেকেছেন তাঁদের এবং সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের লেখাই সাধারণভাবে প্রকাশিত হয়। কখনও কখনও ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়। বিশেষ সংখ্যার ক্ষেত্রে কর্মচারী আন্দোলনের পরিধির বাইরে সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের লেখাও প্রকাশিত হয়। পঞ্চাশ বছর ধরে এই ট্রেড ইউনিয়ন মুখপত্রটির নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশনায় পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলীর সকল সদস্য, ম্যানেজারিয়াল টিমের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও যাঁদের সহায়তার কথা না বললেই নয়, তাঁরা হলেন নিওপ্রিন্ট, মুদ্রাকর ও সত্যযুগ প্রেসের কর্মীবৃন্দ। সংগঠনের চাহিদা অনুযায়ী পত্রিকা অলংকরণে এদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এবং অতি অবশ্যই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সংগঠনের কেন্দ্র থেকে ব্লক পর্যন্ত প্রসারিত কাঠামোর সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ, সংগঠক ও কর্মীরা। সর্বোপরি অগণিত গ্রাহক ও পাঠকের অপরিসীম ভালোবাসায় বলীয়ান হয়ে মাথা উঁচু করে পথ চলেছে সংগ্রামী হাতিয়ার।

সংগঠনের মুখপত্রের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হবে যথোপযুক্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে—এমনটাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল রাজ্য কাউন্সিল। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২ আগস্ট, ২০২১ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'কর্পোরেটপন্থী হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের গর্ভে বামপন্থার সম্ভাবনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রতন খাসনবিশ। পরবর্তীতে বিভিন্ন জেলা সংগঠনের পক্ষ থেকে ঐ একই বিষয়ে আলোচনা সভা সংগঠিত হয়।

সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপনের সমাপ্তিমূলক কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় গত ২৪ জুলাই, ২০২২, কলকাতার মৌলালী যুবকেন্দ্রে। সমাপ্তিমূলক অনুষ্ঠানেও একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। নির্ধারিত বিষয় ছিল 'কর্পোরেট-হিন্দুত্ব চক্র ও ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা'। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক পি সাইনাথ। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার। আলোচনার সভার শুরুতে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক প্রণব চট্টোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জানানো হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য।

সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে পত্রিকার বর্তমান বছরের (মে '২২-এপ্রিল '২৩) গ্রাহক সংখ্যা গত গ্রাহক বর্ষের তুলনায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। □

মহার্ঘভাতার দাবিতে সারা রাজ্যে কর্মচারীদের বিক্ষোভ

আগামী ৩০ আগস্ট, ২০২২ সারা রাজ্যে বেলা ১১.৩০ মি. থেকে ১.৩০ মি. পর্যন্ত দু'ঘণ্টার কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চ। বকেয়া সহ কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান, সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থায়ী নিয়োগ, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ এবং রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার দাবিগুলিকে সামনে রেখে আহূত এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে যৌথ মঞ্চে শামিল ২৫টি সংগঠনের পক্ষ থেকে লাগাতার বিভিন্ন ধরনের প্রচার কর্মসূচী প্রতিপালিত হচ্ছে। শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী তথা জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট জরুরি দাবিগুলির সমর্থনে এবং কর্মবিরতিতে অংশগ্রহণের আবেদন নিয়ে একেবারে প্রত্যন্ত ব্লক স্তর পর্যন্ত প্রচার করছেন বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা।

এই প্রচার কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবেই আজ (২৩ আগস্ট, '২২) কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভবনগুলির সামনে এবং প্রত্যেক জেলা সদরে ও বেশ কয়েকটি জেলায় মহকুমার স্তরেও টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ কর্মসূচীর ডাক দিয়েছিল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। আসন্ন কর্মবিরতির আন্দোলন কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রতিফলন ঘটে আজকের বিক্ষোভ সভাগুলিতে। কলকাতায় নবমহাকরণ, কালেক্টরেট, খাদ্যভবন, বাণিজ্যকর দপ্তর ও বিকাশভবনের সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভাগুলিতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য রাখেন। রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচীর পাশাপাশি এদিন সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখার উদ্যোগে আলিপুর জাজেস কোর্টের সামনে চার ঘণ্টা ব্যাপী গণঅবস্থান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এই গণঅবস্থান কর্মসূচীতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। □

মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারির চাপে ধুঁকছে দেশের অর্থনীতি

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া সাম্প্রতিক তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ২০২১ সালের তুলনায় এবছরের এপ্রিল মাসে দেশে পাইকারি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার ১৫.০৮ শতাংশ। গত দেড় দশকে এই হারে পাইকারি পণ্যের কখনো মূল্যবৃদ্ধি ঘটেনি। দেশের মানুষের বিকিকিনির জন্য যে খুচরো বাজার, সেখানে মূল্যবৃদ্ধির হার চলতি বছরে আগস্ট মাসের মধ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্ধারিত 'সহ্যসীমা' অতিক্রম করে গেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্ধারিত এই 'সহ্যসীমা' হল ৬ শতাংশ বৃদ্ধির হার। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ খাদ্যশস্য এবং জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি। এই তথ্য সরকার নিজেই প্রকাশ করেছে, তাই এই নিয়ে কোনো বিতর্কের জায়গা নেই। স্বভাবতই একটা বিষয় খুব পরিষ্কার, তা হল দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকাটাই দিনের পর দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। এর সাথে গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো যুক্ত হয়েছে বেকারির যন্ত্রণা। ক্রমবর্ধমান বেকারির কারণে সিংহভাগ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ক্রমশ কমছে। অবনতি ঘটছে জীবনযাত্রার মানের।

এটাই যখন প্রকৃত চিত্র তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার ভাষণে বলেছেন, দেশ অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী হচ্ছে। অর্থাৎ মানুষের প্রকৃত অবস্থাকে আড়াল করে এক উত্তরসত্য প্রচারে লিপ্ত হয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় সরকার। অথচ যাদের অর্থনীতির প্রাথমিক জ্ঞানটুকু আছে, তারা জানেন মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমার ফলে বাজারে জিনিসপত্রের চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে। পাল্লা দিয়ে হ্রাস পাচ্ছে শিল্পপণ্যের উৎপাদন। এর ফলে বেকারি আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাহিদা আরও কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ সঙ্কটের এক গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছে দেশের অর্থনীতি।

এই পরিস্থিতিতেও নির্দিষ্ট কিছু প্যাকেটজাত খাদ্যদ্রব্যের উপর নতুন করে জি এস টি চাপানোর ফলে জিনিসের দাম আরও বাড়ছে। কেন্দ্রের সরকার যদি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত থাকত, তাহলে এইভাবে পণ্য পরিষেবা কর চাপানো হত না।

সম্প্রতি লোকাল সার্কেল নামে একটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম গ্রামশহরে ২৩,৫০০ জন মানুষের ওপর একটি সমীক্ষা করেছে। সেই সমীক্ষায় জানা গেছে, ৯২ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, গত তিন মাসে তাদের সংসার খরচ বিপুল বৃদ্ধি পেয়েছে।

একটা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সরকার তার নিজের আয় বাড়ানোর জন্য সাধারণ মানুষের ব্যবহারযো পণ্যের উপর জি এস টি-র হার বৃদ্ধি না করে অতি ধনীদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে প্রত্যক্ষ কর আদায় করছে না কেন? আসলে এর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে বিজেপি-আর এস এস পরিচালিত সরকারের কর্পোরেটপ্রেমী শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে। □

ফ্রান্সে বিমান কর্মীদের ধর্মঘট

গত ১৬ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সে বিমান কর্মীদের ধর্মঘটে বাতিল হয়েছে বহু উড়ান। ঐদিন বেতনবৃদ্ধি, নতুন নিয়োগ সহ বিভিন্ন দাবিতে ফ্রান্সের বিভিন্ন বিমানবন্দরে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের কর্মীরা ধর্মঘটে যোগ দেন। ফলে কর্মীর অভাবে সারাদিনে বহু আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিমানের উড়ান বাতিল হয়।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের অসামরিক বিমান পরিষেবা কর্তৃপক্ষ (বি জি সি এ) জনসাধারণকে বিমান কর্মীদের ধর্মঘটের ফলে পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে বলে আগাম সতর্ক করে। এমনকি সম্ভব হলে সফর স্থগিত রাখার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ করা হয়।

সেই আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হল গত ১৬ তারিখে যখন একাধিক বিমান পরিষেবা বাতিল হয়। বেশকিছু বিমান নির্দিষ্ট সময়ের পরে ছাড়ে। এয়ার ফ্রান্স ৫৫ শতাংশ উড়ান ঐদিন বাতিল করেছে। পাশাপাশি রায়ান এয়ার, ইজিজেট এবং ভেলোটির মতো একাধিক সংস্থাও বহু বিমান বাতিল করে।

ফ্রান্সে কোভিড অতিমারীর দাপট কমার পরে পাল্লা দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। এজন্য এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের কর্মীদের সংগঠন এস এন সি টি এ ১৬ তারিখ ২৪ ঘণ্টা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। ধর্মঘটীদের অন্যতম দাবি ছিল নতুন কর্মী নিয়োগ। যেহেতু বর্তমানে এ টি সি-র কর্মীদের বিভিন্ন বিমান বন্দরে কর্মীর অভাবে অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হচ্ছে, ফলে নতুন নিয়োগের দাবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হিসেবে হাজির হয়েছে। ইউরোপে গত কয়েক মাসে ধর্মঘট এবং কর্মীর অভাবে বহু বিমান বাতিল হয়েছে। ধাক্কা খেয়েছে মহামারীর পরে অসামরিক বিমান শিল্পের ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা। বিভিন্ন দেশে বিমান চালক সহ পরিষেবার সাথে যুক্ত বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা মূলত চড়া মূল্যবৃদ্ধি এবং কর্মী নিয়োগ এই দুটো দাবিকে সামনে রেখে সংগঠিত আন্দোলন চালাচ্ছে। □

ব্লক সম্মেলন

বান্দোয়ান (পুরুলিয়া)

গাজোল (মালদা)

বকেয়া ডিএ-র দাবিতে রাজ্য কর্মীদের বিক্ষোভ

৩১ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদানের দাবি জানিয়ে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় (৮.৯.২২) টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ দেখালেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতে কর্মরত কর্মচারীরা। নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস, বিকাশভবন, ভবানী ভবন, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ (চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল) প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভাগুলিতে কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। আগামীকালও (৯ সেপ্টেম্বর) কলকাতার আরও কয়েকটি বৃহৎ প্রশাসনিক দপ্তর সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বকেয়া ডিএ-র দাবিতে এই বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২০-২১ মে মহার্ঘভাতার দাবি সহ সর্বমোট পাঁচ দফা দাবিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে কলকাতার রাজপথে সারা রাতব্যাপী অবস্থান করেছিলেন কয়েক হাজার কর্মচারী। পরবর্তীতে গত ৩০ আগস্ট রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ মোট ২৫টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চের আহ্বানে দু-ঘণ্টা কর্মবিরতিতে শামিল হয়েছিল হাজার হাজার কর্মচারী ও শিক্ষাকর্মীরা। শিক্ষকদের সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে ঐদিনই রাজ্যের ২০টিরও বেশি ডি আই অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। জরুরি পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মচারীরা দাবি-ব্যাজ পরিধান করে কর্মবিরতির কর্মসূচীর প্রতি সংহতি জানান। অর্থাৎ শিক্ষক-কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার অধিকারকে বিভিন্ন ভাবে অস্বীকার করার যে প্রবণতা (এমনকি আদালতের অভ্যন্তরেও) রাজ্য সরকারের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে ক্রমেই ক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উল্লিখিত দুটি কর্মসূচী সহ আজকের বিক্ষোভ সভাগুলিতে এই ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছে। বকেয়া মহার্ঘভাতা সম্পর্কে রাজ্য সরকারের মিথ্যাচার ও উপেক্ষার মনোভাবের কোনো পরিবর্তন না ঘটলে, আগামী দিনে বৃহত্তর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচীর দিকে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃবৃন্দ আজকের বিক্ষোভ সভাগুলি থেকে। □

কর্পোরেট পুঁজির গ্রাসে ভারতীয় মিডিয়া

সংগ্রামী হাতিয়ারের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বর্ষব্যাপী কর্মসূচীর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে গত ২৪ জুলাই, ২০২২ কলকাতার মৌলালীর যুবকেন্দ্রে আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক পালাগুম্মি সাইনাথ। তাঁর সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি এখানে প্রকাশিত হল।—সম্পাদকমণ্ডলী

পি. সাইনাথ

অনুলিখন ও অনুবাদ ঃ শাশ্বতী মজুমদার

কয়েক সপ্তাহ আগে ২৫ জুন রাতে পিপলস্ আর্কাইভ অফ রুরাল ইন্ডিয়ার দুই তরুণ সহকর্মীকে আমি এদেশের প্রধান প্রধান ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে কি লেখা হচ্ছে তার ওপর দুসপ্তাহ ধরে নজর রাখতে বলেছিলাম। তারা তিন সপ্তাহ কাজটি করেছিল। আমরা ২৬ জুন থেকে কাজটি করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তার কারণ হল জুন ২৫-এ তিস্তা শীতলবাদকে যেভাবে গ্রেপ্তার করা হয় তা এত ভয়ঙ্কর যে হতবুদ্ধি হয়ে যেতে হয়। তার দুদিন বাদে মহম্মদ জুবেরের গ্রেপ্তার হন। আমার তরুণ সহকর্মীরা কাজের সঙ্গে সঙ্গে যাতে শিখতে পারে সে জন্য তাদের দুধরনের জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে বলেছিলাম। এক, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়—যা সংবাদপত্রের নিজস্ব বক্তব্য। দুই, উত্তর সম্পাদকীয়— সম্পাদকীয়র বিপরীত পৃষ্ঠায় মতামতের কলাম, যাতে সরাসরি সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি নাও থাকতে পারে—সাধারণভাবে তা থাকলেও কখনও কখনও ভারসাম্য রাখার জন্য তাতে দু-একজন বামপন্থীর মতামতও ছাপানো হয়। দু'সপ্তাহে ৭০টি সম্পাদকীয় জোগাড় করা হয়েছিল। শুধু উত্তর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার মতামতের কলামে এবিষয়ে সামান্য কয়েকটি লেখা ছিল, যেমন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে প্রতাপ ভানু মেহতার একটি নিবন্ধে স্পষ্টভাবেই এই দুটি গ্রেপ্তারের ঘটনার নিন্দা করা হয়েছে। বর্তমানে এধরণের শক্তিশালী লেখা একেবারেই ব্যতিক্রমী। অধিকাংশ পত্রিকায়, যেমন হিন্দুস্তান টাইমসে, কী সম্পাদকীয়, কী উত্তর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা কোথাও কোনো লেখা ছিল না তিস্তা শীতলবাদ এবং মহম্মদ জুবেরের গ্রেপ্তার বিষয়ে। কোনো কোনো সংবাদপত্র বিষয়টিতে আইনী পরিভাষা নিয়ে কিছু সংশয় তৈরি হয়েছে বা যেভাবে ঘটনা ঘটানো হয়েছে তার ত্রুটি ইত্যাদি বিষয়ে লিখেছিল। কিন্তু কোনো সংবাদপত্রের কোনো একটি সম্পাদকীয়তেও স্পষ্ট করে সরকারকে বলা হল না যে যা করা হয়েছে তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না, যা হয়েছে তা অন্যায়, এখনই এটা প্রত্যাহার করো। এর কতটা ভয়ে আর কতটা সহমত পোষণের জন্য তা তর্ক সাপেক্ষ। যে ৭০টি সম্পাদকীয় সংগ্রহ করা হয়েছিল তার কোনো একটিতেও কেউ সংবাদপত্রের উপযুক্ত প্রতিবাদী ভূমিকা নেবার ইচ্ছেটুকুও দেখায় নি। বলতে পারেনি যে এই ঘটনাটি এযাবৎকালের পুলিশি তৎপরতার নিকৃষ্টতম নমুনা।

২৫ জুন তারিখটি অন্য কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। ঐ দিনই আমাদের দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা হয়েছিল। চেন্নাইতে আমি এক সময়ে একটি বড় ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। প্রতি বছর সেখানে এই দিনে আমরা মিলিত হই এবং জরুরী অবস্থার অন্ধকার দিনগুলি স্মরণ করে ধিক্কার জানাই। সত্যটা হল, যদিও প্রতিবছর আমরা জরুরী অবস্থার কঠোর সমালোচনা করে আসছি, তা যেন ক্রমশ আনুষ্ঠানিকতা হয়ে উঠেছে, কিন্তু বাস্তবে যেন জরুরী অবস্থা ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিকতার রূপ নিচ্ছে এবং আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। জরুরী অবস্থা সম্বন্ধে আমি যা জানি গত ৭ বছরের অভিজ্ঞতা তাকে অনেক দূর অতিক্রম করে গেছে। জরুরী অবস্থা ঘোষিত না অঘোষিত তাই নিয়ে বিতর্ক অর্থহীন। একটি প্রচণ্ড কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে আমরা বাস করছি। এটা স্বীকার করা দরকার। বিতর্ক হোক করণীয় নির্ধারণ নিয়ে।

আমি মনে করি যে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তা মোদীর সময়ের আগেই শুরু হয়েছে। শেষ আট বছরে তা পূর্ণ ফলবতী হয়েছে। কে শাসন করছে এই দেশ? আমি ২০ বছর ধরে এই বিতর্কটা চালাচ্ছি। দেশ চালানোর জন্য যে জোট গড়ে তোলা হয়েছিল তখনই বোঝা গেছিল পরে কি ঘটবে। যা বলেছিলাম সেটাই হল, এটাই আমার কাছে যন্ত্রণাদায়ক।

এখন এদেশ শাসন করছে সামাজিক-ধর্মীয় মৌলবাদী এবং বাজার অর্থনীতির অন্ধবিশ্বাসীদের জোট। এদের মিলনে কী ঘটতে পারে তার নমুনা আজকের কর্পোরেট মিডিয়া। আপনারা দেখতে পাবেন অনেক অগ্রগণ্য অর্থনীতিবিদ আছেন যারা বিজেপির অর্থনীতিতে যতটা স্বচ্ছন্দ ততটাই স্বচ্ছন্দ কংগ্রেসের অর্থনীতিতে। যারা আইএমএফে ভারতের প্রতিনিধি তাদের দেখুন,তারা সবাই উপদেষ্টা হয়ে আছেন। যারা পরিকল্পনা কমিশনের উপদেষ্টা ছিলেন তারাই এখন নীতি আয়োগের উপদেষ্টা। অনেকে আছেন যারা একই সঙ্গে ধর্মীয় মৌলবাদী এবং বাজার মৌলবাদী। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যারা দুজন এই দেশটা চালাচ্ছেন তারা উভয় রকমের মৌলবাদী। তারা নিজেদের ধর্মীয় মৌলবাদী হিসেবে সগর্বে ঘোষণা করেন,তেমনি তারা আবার বাজার মৌলবাদীও।

প্রতিদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী আমাদের মনে করিয়ে দেন এবছর স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ। এদিকে পাঠ্য পুস্তকের সাম্প্রদায়িকীকরণ করছে সরকার। শুধু যে ইতিহাসের পুনর্লিখন হচ্ছে শুধু তাই নয়, নিজেদের পুনর্লিখনেরও পুনর্লিখন করছে বিজেপি! চারিদিকে যা হচ্ছে সে সমস্ত অবৈধ কাজের সহযোগী মিডিয়া। হয় নীরবতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে নয়তো স্পষ্ট সমর্থনের মধ্যে দিয়ে তারা সহযোগিতা করছে।

স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষ উপলক্ষ্যে সরকার প্রথমেই একটি ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেছে। আমি আপনাদের সেটা দেখার জন্য অনুরোধ করব। 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' নামে ওয়েবসাইটটি এবং ঐ সম্পর্কিত কাজের জন্য প্রাথমিক বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ১১০ কোটি। এটা আরও বাড়বে। এর মধ্যে দিয়েও সাম্প্রদায়িকীকরণ করা হচ্ছে পূর্ণমাত্রায়। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের ওয়েবসাইটে পাঁচটি উল্লেখযোগ্য বিষয় রয়েছে। ১। স্বাধীনতা সংগ্রাম, ২। ৭৫ বছরে চিন্তাধারা, ৩। ৭৫ বছরে সমাধান (এর অর্থ কে বুঝেছেন আমি জানি না), ৪। ৭৫বছরে কর্মসূচী, ৫। ৭৫ বছরে কৃতিত্ব দাবি করা হয়েছে প্রতি ৩০ মিনিটে দেশের কোথাও না কোথাও একটি করে অনুষ্ঠান হচ্ছে। হোম পেজে দেখা যাবে প্রতিদিন ৫০ টি অনুষ্ঠান হচ্ছে,প্রতি ঘন্টায় দুটি অনুষ্ঠান। কেউ দার্জিলিংয়ে গিয়ে 'বন্দেমাতরম' গাইলেও সেটিকে

আলোচনা করছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক পি সাইনাথ

একটি অনুষ্ঠান ধরা হচ্ছে। রাজ্য সরকারগুলিকে এই রকম অনুষ্ঠান পাঠাতে বলা হয়েছে। হোমপেজে দেখাচ্ছে এপর্যন্ত ৬৭০০ অনুষ্ঠান হয়েছে।

প্রসঙ্গত, আমি একটি বই লিখছি ভারতের শেষ জীবিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে। তাদের মধ্যে চারজন পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার। সরকার কথিত অজ্ঞাত বীররা কারা? নানা রাজা রাণীর কথা রয়েছে। কিন্তু যেসব নাম সরকারী তালিকা থেকে বাদ পড়েছে তা চমকপ্রদ। এমনকি যারা অতটা অপরিচিতও নন, তাদের অনেকের নাম পড়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে সুপরিচিত। যেমন, আমার ব্যক্তিগত পছন্দের একটি নাম—ভগৎ সিং। তার নাম ওয়েবসাইটে নেই। যাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের সবাই যে নাম-না-জানা ব্যক্তি তাও নন। টিপু সুলতানের নাম তালিকায় নেই, এই নিয়ে কর্ণাটকে প্রবল বিতর্ক হচ্ছে। কর্ণাটকে এক মন্ত্রী পাঠ্য বই থেকে টিপু সুলতান এবং ভগৎ সিংকে বাদ দিতে বলেছেন। তার জায়গায় তারা সাভারকারকে যুক্ত করেছেন।

সাভারকর সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। তাঁর অতীত সম্পর্কে আমি কিছু পড়াশোনা করেছি। প্রথম যে কথাটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে চাই, সাভারকর ১৯১১ সাল পর্যন্ত একজন সত্যিকারের বিপ্লবী ছিলেন। তারপর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আন্দামানে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি এতো ডিগবাজি খান যে ক্ষমা ভিক্ষা করে একের পর এক আবেদন করতে থাকেন ব্রিটিশরাজের কাছে। নিজেকে সংশোধন করার এবং তরুণ যুবকদের বিপ্লবের পথ থেকে ফিরিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জ্ঞানগরিমার পথে নিয়ে আসার প্রতিজ্ঞা করেন। এসব আপনারা পড়ে থাকতে পারেন।

কিন্তু এই 'অগোচরে থাকা বীর' সম্পর্কে আরও চিত্তাকর্ষক কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। ১৯২৬ সালে 'দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস অফ ব্যারিস্টার সাভারকর' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটির লেখক চিত্রগুপ্ত। অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতকে চিত্রগুপ্ত বহুল ব্যবহৃত একটি ছদ্মনাম ছিল। পুরাণে চিত্রগুপ্ত ছিলেন যমরাজের লিপিকর, তথ্য সংরক্ষক। তাই তার বিশ্বাসযাগ্যতা রয়েছে, প্রামাণ্যতা রয়েছে। বইটি হেজিওগ্রাফির এক অসামান্য উদাহরণ। অবিশ্বাস্য সব বর্ণনা রয়েছে—সুদর্শন সাভারকর,প্রচারক সাভারকর, বিশ্বকোষসদৃশ জ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্রিটিশ সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করে। ১৯৪২ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়। ১৯৮৬ সালে বইটি পুনর্মুদ্রিত হয়। তিনটি সংস্করণেই লেখকের নাম চিত্রগুপ্ত। কিন্তু শেষের সংস্করণের ভূমিকা লেখক লিখেছেন যে সাভারকরের নিজের ভাই তাঁকে বলেছিলেন সাভারকর নিজেই চিত্রগুপ্ত। অর্থাৎ সাভারকর তাঁর আত্মজীবনী লিখে সেটাই জীবনী হিসাবে উপস্থাপন করেছিলেন! আপনারা বইটি পড়ে দেখবেন কিভাবে বইটিতে হাস্যকরভাবে সাভারকর নিজেই 'সাভারকর' সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করেছেন! আমি তার পূর্বের ভূমিকাকে অস্বীকার করছি না। কিন্তু তিনি নিজেকে যেভাবে গৌরবান্বিত করেছেন,যেভাবে নিজের সম্পর্কে বাড়িয়ে বলেছেন তা রচনা এবং প্রকাশনার দিক থেকে অত্যন্ত অনৈতিক এবং ইতিহাসের অপলাপ।

যাহোক, এবার বলি কেন আমি বলি বিজেপি তাদের নিজেদের 'পুনর্লিখনের পুনর্লিখন' করছে। ১৯৯০ সালে একটি টেলিভিশন সিরিয়াল দূরদর্শনে প্রচারিত হয় 'দ্য সোর্ড অফ টিপু সুলতান'। সঞ্জয় খান অভিনয় করেছিলেন। তাই নিয়ে সেসময়ে প্রচুর চিৎকার-চেঁচামেচি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ধর্ণা ইত্যাদি হয়েছিল। তারদশ বছর আগে ১৯৮০ তে মুম্বাইয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি তৈরি হয়েছে আগের জনসঙ্ঘ ভেঙে। তারা ঘোষণা করেছে যে তারা 'গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র'র পথে চলবে। 'সমাজতন্ত্র' শব্দটা এখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ! বিজেপি তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সহ সভাপতি কে আর মালকানিকে নিয়ে এক সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। তিনি একজন নামী সাংবাদিক ছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে তাদের মুখপত্র 'অর্গানাইজার' সম্পাদক ছিলেন। এর সঙ্গে তিনি হিন্দি 'পাঞ্চজন্য'-রও সম্পাদক ছিলেন। আরএসএসের আর কেউ কখনও এই দুটি পদে একসঙ্গে ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে আমার চেনাশোনা ছিল। মালকানি ডব্লুটিও, ডাঙ্কেল প্রস্তাব, মেধাসত্ত্ব অধিকার ইত্যাদি প্রশ্নে বামপন্থীদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। ফলে তখন তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হত।

বিভিন্ন জাতীয় সেমিনার ইত্যাদিতে দেখা হত। টিপু সুলতান এবং টিপুর শাসনকাল নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হত। তিনি টিপু সুলতান সম্পর্কে তিনি পড়েছিলেন প্রোগ্রেস পাবলিশার্সের একটি বই থেকে। তাঁর মতো কট্টর স্বয়ংসেবক, মনুস্মৃতির দ্বিধাহীন সমর্থক টিপু সুলতান সম্পর্কে লিখেছিলেন, "যত আমি টিপু সম্পর্কে পড়িতত আমি তার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হই।" তিনি হচ্ছেন একমাত্র ভারতীয় রাজন্য যিনি ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই মানুষটি ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করেছিলেন, বেকার শ্রম নিষিদ্ধ করেছিলেন। ইনি সেই রাজা যিনি প্রতি চার মাইল অন্তর একটি করে বিদ্যালয় স্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলেন। ইনি সেই ব্যক্তি আধুনিক পরিবেশবাদীরা যাকে একজন পরিবেশবাদী শাসক বলবেন। যখন তাঁর সেনাবাহিনীর একটি বড় অস্ত্র কারখানার জন্য কাবেরী নদীর জল দূষিত হচ্ছিল, এবং এর জন্য সেখানকার মানুষ কারখানা সরিয়ে নেবার দাবিতে প্রতিবাদে নামে এবং বলে পবিত্র নদীকে দূষিত করা উচিত নয়, তখন তিনি কারখানা সরিয়ে নেন। এটা বলা দরকার, টিপু সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা প্রকৃতপক্ষে সত্য এবং প্রামাণ্য। টিপু সম্পর্কে অন্য অনেক ঐতিহাসিকের বানানো ঘটনা নিয়েও লেখা আছে। তিনি এটাও বলেছিলেন, "ক'জন রাজার বংশধরকে কলকাতায় রিকশা চালাতে হয়েছে?" প্রগ্রেস পাবলিশার্সের বই অনুযায়ী তিনি বলেছিলেন, টিপু নেপোলিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রগ্রেস পাবলিশার্সের বইতে আপনি দেখবেন যে টিপু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত উপাধি ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং জীবনের শেষ কয়েক মাস নিজেকে 'নাগরিক টিপু' হিসাবে পরিচয় দিতেন। মালকানি লিখেছেন, "মৃত্যুর আগে পর্যন্ত টিপু ইংরেজদের বিরুদ্ধে এমন লড়াই করেছিলেন যে তারা সারা জীবনে আর এমন লড়াই লড়েনি। টিপুর মৃত্যুর পর ভারতের স্বাধীনতা পেতে দেড়শ' বছর ধরে নির্বাপিত ছিল। স্বাধীন ভারত টিপুকে অভিবাদন না করে পারে না"। এই বইটির কোনো উল্লেখ কোথাও করা হয়না। এটি একটি বিখ্যাত বই। নাম 'ইন্ডিয়া ফার্স্ট'। আমাজনে পাওয়া যায়। কোনো সংবাদপত্র টিপুকে নিয়ে বিতর্কের বিষয়টি বিশ্লেষণ করেনি। ব্যাঙ্গালোরের ডেকান হেরাল্ড হয়তো কিছুটা করেছে। ডেকান হেরাল্ড খুবই সাহসী সংবাদপত্র। মনে রাখতে হবে সেটি বিজেপি শাসিত রাজ্যের পত্রিকা। অবিজেপি রাজ্যের সংবাদপত্রের সঙ্গে তার তুলনা চলবে না।

পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক প্রণব চট্টোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

বহু পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে, কিন্তু কোনো খবরের কাগজ সাভারকার এবং ভগৎ সিংকে এক করে দেখার বিষয়টাকে চ্যালেঞ্জ করে নি। কেউ মতামত বিশ্লেষণ করে দেখায়নি টিপুকে নিয়ে যা হচ্ছে তা জালিয়াতি। এবিষয়ে কয়েকজনের অসাধারণ লেখা কোনো কোনো খবরের কাগজের মতামতের কলামে বেরিয়েছে, তারা যদিও ঐ পত্রিকায় কাজ করেন না। একে কী বলবেন? ভয় না ষড়যন্ত্র?

অবিশ্বাস্য রকমের অজ্ঞতাও রয়েছে। কতগুলি সংবাদপত্র বা চ্যানেল আপনাদের নজরে এনেছে যে প্রকৃতপক্ষে অসাধারণ দুটি সংবাদপত্রের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি হচ্ছে এবছরে? সে দুটি এই বাংলারই সংবাদপত্র এবং উভয়ই রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি মীরাত-উল-আখবর, ১৮২২ সালের ১২ এপ্রিল এবং দ্বিতীয়টি সংবাদ কৌমুদী, ১৮২২ সালের ডিসেম্বরে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। মীরাত-উল-আখবর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র। ভারতীয় সংবাদপত্রের মহান ঐতিহ্য শুরু হয়েছিল মীরাত-উল-আখবর দিয়ে। মীরাত-উল-আখবরের ভাষা বাংলা ছিল না, ফার্সি ছিল। সেসময়ে ফার্সি ছিল অভিজাতদের ভাষা, মোগল রাজসভার ভাষা। কজন সাংবাদিক বলতে পারেন তিনি রামমোহনের মতো দশটি ভাষায় পারঙ্গম? রামমোহন রায় ফরাসী ভাষাও জানতেন এবং ফরাসীদের লিখে সেসময়ের সেরা ফরাসী সমালোচকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছিলেন। মীরাত-উল- আখবরের প্রথম বা দ্বিতীয় সংস্করণেই এমন একটা বিষয় উত্থাপিত হয়েছিল যা ২০০ বছর পরও খুবই প্রাসঙ্গিক। প্রতাপ নারায়ণ দাস নামে একজন রায়তকে সামান্য অপরাধে বেত্রাঘাত করার জন্য কুমিল্লা কোর্টের বিচারপতি আদেশ দিয়েছিলেন। বেত্রাঘাতে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। রামমোহন রায় এই ঘটনায় এক মর্মভেদী সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। নিজের নাম আড়াল করে লেখা নয়, মীরাত-উল-আকবরের প্রথম পাতায় স্বনামে লিখে রামমোহন সেই বিচারপতিকে তুলোধোনা করেন। বহু সংবাদপত্র এমনকি তাঁর বিরোধীরাও ঐ লেখাটি উদ্ধৃত করেন এবং 'বাকিংহাম' ইংরেজীতে অনুবাদ করে সেটি ছাপায়। এর ফলে দুটি ঘটনা ঘটে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের যুগের সুপ্রিম কোর্ট কুমিল্লার বিচারপতিকে সরিয়ে দেয় এবং তার বিচার শুরু করে। আজকে এরকম ঘটতে দেখা যায়? আজকে কাউকে এরকম লেখা লিখতে দেখা যায়? (নুপুর শর্মা সম্বন্ধে বিচারক বিরূপ মন্তব্য করলে অবশ্য অন্য কথা!) দ্বিতীয় যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা'হল সঙ্গে সঙ্গে গভর্নর জেনারেল অনেকগুলি প্রকাশনাবিরোধী আইন চালু করেন। পরে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' নামে যে আইন হয়েছিল এ ছিল তারই পূর্বসূরী। এর প্রতিক্রিয়ায় রামমোহন রায় মীরাত-উল-আখবর বন্ধ করে দেন এবং লেখেন যে এই রকম অপমানজনক অমর্যাদাকর পরিস্থিতিতে কাজ করবেন না। কিন্তু তিনি এরপর অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ঐসমস্ত বিষয়বস্তু নিয়ে বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশ শুরু করলেন। কারণ ততদিনে তিনি অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করেছেন যে অভিজাতদের জন্য ফার্সিতে লেখার থেকে সাধারণ মানুষের জন্য মাতৃভাষায় লেখা অনেক

● সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করছেন কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখা

ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর

একটি বামপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে

প্রণব কর

১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের লেবার সরকার ঘোষণা করল যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশরা ভারতের শাসনভার ভারতীয়দের হাতে তুলে দেবে। এই কাজ সম্পন্ন করবার জন্য লর্ড ওয়াভেলের পরিবর্তে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ২২ মার্চ ভারতের ভাইসরয় হিসেবে মনোনীত হয়ে এলেন। সে সময় পরাধীন ভারতে প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হত। অনেকেই তাই ধারণা করেছিলেন যে ১৯৪৮ সালের ২৬ জানুয়ারি হয়তো ভারতের স্বাধীনতা দিবস ঘোষিত হবে। কিন্তু স্বাধীনতা দিবস হিসেবে বেছে নেওয়া হল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টকে—সে দিনটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির কাছে জাপানের আত্মসমর্পণের দ্বিবার্ষিকী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটি অহঙ্কারের দিন। জ্যোতিষীদের মতে ১৫ আগস্ট দিনটি অশুভ হওয়ায় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান শুরু হয় ১৪ আগস্ট রাত ১১টা থেকে।

ভারতের স্বাধীনতা এলো দেশভাগ এবং ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার মধ্য দিয়ে। দিল্লীতে যখন স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে মহাসমারোহে, তখন মহাত্মা গান্ধী দিল্লী থেকে অনেক দূরে কলকাতার বেলেঘাটায় অনশন এবং প্রার্থনায় বসেছেন দাঙ্গা বন্ধের জন্য। এই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিলেন এবং দেশভাগের ফলে দেড় কোটি লোক উদ্বাস্তু হয়েছিলেন। সরকারী হিসেবে ভারতে উদ্বাস্তু হয়ে আসেন ৭২,৯৫,৮৭০ জন এবং পাকিস্তানে ৭২,২৬,৬০০ জন। দেশভাগে যে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিল তারই চূড়ান্ত পরিণতিতে ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী নিহত হন এক ধর্মোন্মাদের গুলিতে। নাথুরাম গডসের গুলিতে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু হলেও এর পিছনে সাভারকারের হিন্দু মহাসভা এবং গোলওয়ালকারের আর এস এস-এর ভূমিকা সর্বজনবিদিত ছিল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে তিনটি মতাদর্শের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। প্রথম দুটি ধারা মনে করত যে ভারতে ভাষাগত, জাতিগত, ধর্মগত এবং সাংস্কৃতিক যে বিপুল বৈচিত্র্য আছে তার মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে রয়েছে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকেই সূত্রায়িত করে এবং বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়েই এক ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তোলা যাবে। উপর থেকে জোর করে কোনো ঐক্যবোধ তৈরি করা যাবে না। এই ধারা দুটির প্রতিনিধিত্ব করত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে কংগ্রেস ঘোষণা করে যে স্বাধীন ভারত হবে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আরও এগিয়ে গিয়ে ঘোষণা করে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতকে রক্ষা করতে হলে ভারতকে একই সঙ্গে হতে হবে সমাজতান্ত্রিক। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি ধবরনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ভারতের কথা ঘোষণা করে। এই দুটি ধারারই বিপ্রতীপে তৃতীয় ধারাটি ঘোষণা করে স্বাধীন ভারতের চরিত্র নির্ধারিত হবে ধর্মের ভিত্তিতে। এই ধারা টি পরিচালিত হত দুটি শক্তির দ্বারা—একটি ছিল মুসলিম লীগ যারা 'ইসলামিক রাষ্ট্র'-এর কথা বলত এবং অপরটি ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, যারা 'হিন্দু রাষ্ট্র'-র কথা বলতো। মুসলিম লীগ ব্রিটিশ শক্তির সহায়তায় দেশভাগের মধ্য দিয়ে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য 'ইসলামিক রাষ্ট্র' হাসিল করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের 'হিন্দু রাষ্ট্র'-এর স্বপ্ন অধরা থেকে যায় মূলত ভারতের শ্রমিক-কৃষক সহ সর্বস্তরের মানুষের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হবার জন্য। কিন্তু স্বাধীনতার স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষপূর্তির সময় ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের রমরমা এবং তাদের 'হিন্দু রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রয়াস আঘাত হানছে 'বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান'—এই ধারণাটিকে।

স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সদর্থক পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাধীন ভারত একটি সংবিধান গ্রহণ করে যার মূল প্রস্তাবনায় ভারতকে সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা করা হয় এবং পরবর্তীতে এর সঙ্গে ৭২তম সংশোধনীতে সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শব্দগুলিও যুক্ত করা হয়। এই সংবিধানে বেশ কিছু মৌলিক অধিকার ভারতীয় জনগণকে অর্পণ করা হয়, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশমূলক নীতি প্রণয়নের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়, চালু হয় সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা। পাশাপাশি বিদেশনীতির ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করা হয়। তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি ছিল জাতীয় পরিকল্পনা নীতি ও স্বনির্ভর রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্র গঠনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা থেকে মুক্ত একটি স্বাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বের রাশ ছিল দেশীয় বুর্জোয়াদের ঘনিষ্ট রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের হাতে। স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দেশীয় বুর্জোয়ারা তাদের শ্রেণী স্বার্থের পক্ষে সুবিধাজনকভাবে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিল প্রথম থেকেই। স্বাধীনতার সময় দেশে ৫০০টির বেশি স্বশাসিত রাজন্য ছিল। এই রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে ইংরেজরা ভারত বা পাকিস্তান—যে কোনো একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়া বা স্বাধীন থেকে যাবার সুযোগ রেখে দিয়েছিল। কিন্তু এই স্বশাসিত রাজ্যগুলি স্বাধীন অবস্থায় থাকলে ভারতের স্বাধীনতাটাই অর্থহীন হয়ে পরতো, কারণ এই স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলি ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ক্রীড়ানকে পরিণত হত। ফলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত নেহরু অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে ধৈর্য ধরে এই স্বশাসিত রাজ্যগুলিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে বল্লভভাই প্যাটেলের সচিব ভি পি মেননের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশীয় বুর্জোয়াদের বৃহৎ বাজার গঠনের জন্য এই অখণ্ড ভারত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

স্বাধীনতার পর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করল বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণী, বুর্জোয়ারা ছিল বড় পার্টনার এবং জমিদার সম্প্রদায় ছিল ছোটো পার্টনার। কিন্তু বুর্জোয়ারা তাদের আধিপত্য নিরঙ্কুশ করতে ভূস্বামীদের অধিকার কিছুটা ছেঁটে দেয়। এক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করে। প্রথমটি হল তারা সংসদে আইন এনে ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারতন্ত্র বিলোপ করে। যদিও এর মধ্য দিয়ে মূলত জমির মালিকানার কিছু পরিবর্তন হয়, কিন্তু গরিব কৃষকের কাছে জমির মালিকানা পৌঁছায় না। তা সত্ত্বেও এর ফলে জমিদারদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বেশ কিছুটা হ্রাস পায়। দ্বিতীয়ত ভূমি সংস্কারের পক্ষে সামান্য কাজ করতে গেলেও সংসদে যে আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন আছে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই বাধা অতিক্রম করবার জন্য ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত আইনগুলিকে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে সংবিধানের নবম তপসিলের অন্তর্গত করা হয়। ফলে এই আইনগুলির বৈধতা আদালতে চ্যালেঞ্জ করার জায়গা নেই। ভারতীয় বুর্জোয়াদের ভূস্বামীদের সঙ্গে লড়াই এখানেই শেষ। এর মধ্য দিয়ে যেসব জমিদাররা গ্রাম ছেড়ে পাকাপাকিভাবে শহরে চলে গিয়েছিলেন তাদের কিছু জমি উদ্ধার হয় এবং তা গ্রামের সম্পন্ন কৃষকদের মধ্যে বিলি হয়। কৃষক সম্প্রদায়ের উপরের দিকের ১৫ শতাংশ যে জমির অংশীদার ছিল তাদের মধ্যেই মালিকানার পরিবর্তন হয় শুধু, কিন্তু জমির যে কেন্দ্রীভবন ছিল তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ আমূল ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে গরিব প্রান্তিক কৃষক, বর্গাদার এবং ক্ষেতমজুরদের হাতে জমি তুলে দেবার মাধ্যমে সামন্ততন্ত্রকে ভেঙে ফেলে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটানোর কর্মক্রম দেশীয় বুর্জোয়ারা গ্রহণ করেনি।

১৯৪৬-এর ঐতিহাসিক নৌবিদ্রোহ

কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা বলতে হবে যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষকদের যে বিপুল অবদান ছিল তাকে স্বীকৃতি দিয়েই স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব ঘোষণা করেছিলেন যে স্বাধীনতার পরে শ্রমিক-কৃষকদের দূরাবস্থা দূর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সেই অনুসারে সামগ্রিকভাবে কৃষক সমাজের পক্ষে হিতকর কিছু ব্যবস্থা স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র গ্রহণ করে। বাজারজাত কৃষিজাত দ্রব্যের একটা অংশ লাভজনক দামে সরকারের কেনার ব্যবস্থা করা হয়। তাঁতীদের হাতে বোনা কাপড়ের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সরকার লাভজনক দামে কেনার অঙ্গীকার করে। একই সঙ্গে বিদেশ থেকে কৃষিজাত ফসলের আমদানিতে বিভিন্ন রকমের শর্ত চাপিয়ে দেশীয় কৃষিজাত পণ্যের বাজাকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কৃষিতে প্রয়োজনীয় সারে ভর্তুকির ব্যবস্থা, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্প সুদের হারে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। নতুন নতুন উন্নত প্রজাতির বীজ তৈরির জন্য সরকারী গবেষণাগার তৈরি করা হয়। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বেশ ভালো পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতার সময়ে যেখানে মাথাপিছু খাদ্যশস্যের পরিমান ছিল ১৫০ কেজি প্রতি বছর তা ১৯৮০ সাল নাগাদ বেড়ে দাঁড়ায় ১৮০ কেজি প্রতি বছর।

একই সঙ্গে শ্রমিকদের জন্য কিছু শ্রম আইন তৈরি করা হয় যা শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের দৈনন্দিন সমস্যাগুলির মোকাবিলায় কিছুটা সুবিধা দিয়েছিল। দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ, বছরে তিন সপ্তাহ স্ববেতন ছুটি। প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ইএসআই-এর ব্যবস্থা---এইসব আইনগুলি সাময়িকভাবে শ্রমিকদের কিছুটা সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিল।

স্বাধীনতার পরবর্তীতে ভারতীয় বুর্জোয়ারা এদেশে যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইলেন তার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সে গড়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস না করেই, যদিও বিদেশী লগ্নিপুঁজির উপর তার নির্ভরতা ছিল। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস না করে ভারতীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া হিসেবে এদেশে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পক্ষেত্র গড়ে তোলা হয়, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা থেকে বিদেশী পুঁজিকে সরিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন করা হয়।

বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা নেওয়া হল তার বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি প্রসারণশীল দেশীয় বাজার। ভারতের মতো একটি কৃষিপ্রধান দেশ এই বাজার নির্মাণের সাফল্য নির্ভর করেছিল কৃষি উৎপাদনের অগ্রগতির উপরে। সাধারণ মানুষের শিল্পজাত পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হলে কৃষিজাত পণ্যকে সস্তা হতে হবে, যা সম্ভব হবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে। কিন্তু আমূল ভূমি সংস্কার না হওয়ার ফলে একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার পর্যাপ্ত হয়নি, তেমনই উৎপাদিত পণ্য মূলত ধনী কৃষকদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। এর ফলে দেশের সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি না পাওয়ায় শিল্পজাত পণ্যের বাজার সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। এর ফলে দেশে বেকারের সংখ্যাও ক্রমশ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় উৎপাদন বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে গেলে আবার মূল্যবৃদ্ধি হয়। এই দুটির কোনোটিই দেশের সাধারণ মানুষের কাছে কাম্য ছিল না। ফলে ভোট ভিত্তিক সংসদীয় ব্যবস্থায় মানুষ তার তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করতে থাকে তৎকালীন শাসকদল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে, বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস সরকারকে পরাস্ত করে। পরিস্থিতি একটা সময়ে এমনই সংঘাতময় জায়গায় পৌঁছোল যে ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন তারিখে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী 'জরুরি অবস্থা' জারি করে সংসদীয় নির্বাচনী ব্যবস্থা সহ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেই স্তব্ধ করে দিলেন। প্রায় দেড় বছর ভারতীয় জনগনের ভোটের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

শেষপর্যন্ত জরুরি অবস্থা বিরোধী প্রবল গণআন্দোলনের চাপে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা তুলে নিতে বাধ্য হলেন ১৯৭৭ সালের ১৮ জানুয়ারি। প্রায় সমসাময়িক সময়ে সারা বিশ্বে পুঁজিবাদের চরিত্রেরও বিপুল পরিবর্তন ঘটতে থাকে। রাষ্ট্রের অধীনস্থ লগ্নীপুঁজি তখন জাতি রাষ্ট্রের শৃঙ্খল অস্বীকার করে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তার চলার পথে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির আমদানির ক্ষেত্রে যেসব পরিমাণগত ও গুণগত বাধা ছিল তা অপসারিত হয়েছে। আশির দশকের গোড়া থেকে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির উত্থান শুরু হলেও, তা বিশেষ গতি পায় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে। এই অবস্থায় ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়ারা বুঝতে পারলেন যে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব মুক্ত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ নির্মাণ করা অসম্ভব এক প্রয়াস। ফলে তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করেই এই দেশে নব্য উদার অর্থনীতির প্রবর্তন ঘটালেন। ৮০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হলেও তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় ১৯৯১ সালে নরসিমহা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বে মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে।

২৪ জুলাই ১৯৯১-এ ভারতের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং তার বাজেট বক্তৃতায় বললেন—"There is no time to lose. Neither the Government nor the economy can live beyod its means year after year. The room for manoeuvre, to live on borrowed money or time, does not exist anymore. Any further postponement of macro-economic adjustment, long overdue, would mean that the balance of payments situation, now exceedingly fifficult, would become unmanageable and inflation, already high, would exceed limits of tolerance." ভারতীয় অর্থনীতির আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাঙ্ক-এর কাছে আত্মসমর্পণ সম্পন্ন হল। আইএমএফ-বিশ্বব্যাঙ্ক-এর সঙ্গে ভারতের পরিকাঠামোগত সংস্কারের শর্তে ঋণদানের চুক্তি সম্পন্ন হয়।

পরিকাঠামোগত সংস্কারের মূলত তিনটি অভিমুখ ছিল---(১) রাজকোষ ঘাটতি (Fiscal deficit)-কে দ্রুত কমিয়ে আনা যাতে করে বাজারে অর্থ যোগানের ক্ষেত্রে লাগাম লাগানো যায়, (২) অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উৎপাদন, বিনিয়োগ এবং মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধানিষেধ তুলে দিয়ে বাজারের ভূমিকা বৃদ্ধি করা এবং (৩) আন্তর্জাতিক স্তরে পণ্য, পরিষেবা, প্রযুক্তি ও মূলধন বিনিময়ের ক্ষেত্রগুলিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া। এই তৃতীয় অভিমুখটিই মূলত বিশ্বায়ন বলে পরিচিত এবং এই তৃতীয় অভিমুখের কার্যকারিতা নির্ভর করে প্রথম দুটি অভিমুখের কার্যকারিতার উপর।

এইভাবে ভারতীয় অর্থনীতির বিশ্বায়িত নব্য উদার অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ও আর্থিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেটুকু আর্থিক সয়ম্ভরতা ভারতের গড়ে উঠেছিল তা ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রগুলিতে প্রথমে বিলগ্নীকরণ, পরে বেসরকারীকরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মালিকানার হাতে তুলে দেওয়া হল। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে ১৭টি শিল্পক্ষেত্রকে শুধু রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার জন্য সংরক্ষিত রাখা ছিল। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র দুটি ক্ষেত্রে, আণবিক শক্তি এবং রেলওয়ে। দেশের খনিজ সম্পদ তুলে দেওয়া হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানার হাতে। রাষ্ট্রায়ত্ব আর্থিক সংস্থাগুলি ব্যাঙ্ক, বীমাতেও বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া চালু হয়ে গেছে।

কংগ্রেস পরবর্তী বিজেপি সরকার আরও আগ্রাসী ভাবে নব্য উদার অর্থনীতি প্রয়োগের আয়োজন করেছে। বিশেষত ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রী হবার পর শ্রমজীবী মানুষের জন্য যে সামান্য সুবিধা দেওয়া হয়েছিল পূর্ববর্তী ব্যবস্থায়, বর্তমান নব্য বাজার অর্থনীতির দাপটে সে সবই তুলে দেওয়া হচ্ছে। ক্ষুদ্র উৎপাদন ক্ষেত্র—যার সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মানুষে রুটি-রুজি নির্ণয় করে তার উপর নেমে এসেছে ব্যাপক আক্রমণ। কৃষিতে যেটুকু ভরতুকি দেওয়া হত তা তুলে নেওয়া হয়েছে। দেশীয় কৃষিপণ্যের বাজারে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল তা তুলে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার কৃষিক্ষেত্রকে কর্পোরেটের হাতে তুলে দেবার জন্য যে তিনটি কৃষি আইন লাগু করতে চাইছিল তা ভারতীয় কৃষকেরা তীব্র লড়াইয়ের মাধ্যমে রদ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই লড়াই শ্রমজীবীদের কাছে স্বাধীনতার ৭৫ বছরে সব থেকে বড় প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে।

কর্পোরেট পুঁজির দাবি অনুযায়ী শ্রমবাজারকে চূড়ান্ত নমনীয় করার উদ্দেশ্যে ২৯টি শ্রম আইনকে ৪টি কোডে ভেঙে দিয়ে লোকসভায় বিল পাশ করিয়েছে বিজেপি। আইনগুলিতে শ্রমিকদের পক্ষে যেটুকু অধিকার ছিল এবং মালিকদের নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সামান্য বিধিনিষেধ ছিল কোডগুলিতে তা প্রায় তুলে দেওয়া হয়েছে। ৭০ শতাংশের বেশি কারখানায় এখন 'হায়ার এন্ড ফায়ার' নীতি প্রয়োগ করা যাবে। মালিকপক্ষ নিয়মিত কাজের ক্ষেত্রে এখন 'ফিক্সড টার্ম' কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে। ধর্মঘট করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।

আর্থিক ক্ষেত্রে সয়ম্ভরতার উপর দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ কতটা মজবুত থাকবে তা নির্ভর করে। নব্য উদার অর্থনীতি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্র যেন সমাজের উর্ধ্বে অবস্থান করে সব শ্রেণীগুলির কল্যাণে নিয়োজিত বলে প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু নব্য উদার অর্থনীতিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা সরাসরি বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে।

এর ভয়ানক প্রভাব পড়েছে সরকারের কার্যকলাপে। বিদেশনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে এই ৭৫ বছরে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভারত স্বাধীন হবার পরে বিদেশনীতির ক্ষেত্রে 'জোট-নিরপেক্ষ' নীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে মূলত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছিল। এমনকি ১৯৭১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তিতে ভারত আবদ্ধ হয়। কিন্তু সেই অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়ে বর্তমান ভারত আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের জুনিয়ার পার্টনারে পরিণত হয়েছে। আমেরিকার

● অষ্টম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

পঞ্চম পৃষ্ঠার পরে

কর্পোরেট পুঁজির গ্রাসে ভারতীয় মিডিয়া

বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি ভাবি এই রকম সম্পাদকীয় আর দেখা যায় না কেন? ফাদার স্ট্যান স্বামী নামে এক ব্যক্তি জেলে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন, ভীমা কোরেগাঁও কেসের আরও ১৫ জন অভিযুক্ত অবর্ণনীয় অমানবিক অবস্থায় জেলে দিন কাটাচ্ছেন। কেউ বয়সজনিত সমস্যায় আক্রান্ত, কেউ অসুস্থ। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের সংবেদনশীলতা কোথায়? সামান্যতম সাহসে ভর করে কেউ বলে উঠতে পারে না—যা হচ্ছে তা অন্যায়? এমনকি জরুরী অবস্থার সময়ে সম্পাদকীয়তে কাঁচি চালানোর প্রতিবাদে কোনো কোনো সংবাদপত্র সম্পাদকীয় সরিয়ে দিয়ে সেই স্থান ফাঁকা রেখেই কাগজ ছাপিয়েছিল। এখন সেই সাহস কোথায়?

কোভিডের সময়ে ২০-২১ সালে সংবাদপত্রের খুবই ভালো ভূমিকা ছিল। ২১ সালের শেষের দিকে সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেলগুলো উত্তরপ্রদেশের অতিমারির পরিস্থিতি নিয়ে দুর্দান্ত রিপোর্টিং করেছিল। সকলেরই মনে পড়বে গঙ্গা, সরযূর তীরে অসংখ্য মৃতদেহের পড়ে থাকার খবর। এক মাস অসাধারণ রিপোর্টিং হয়েছিল। তারপর সব বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে খবর উধাও হয়ে গেল কেন? কারণ, আদিত্যনাথ সরকার সংবাদপত্র থেকে সমস্ত বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল, সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারও পরিকল্পিত ভাবে বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে শুরু করেছিল। একমাত্র ব্যতিক্রমী ভূমিকা ছিল 'দৈনিক ভাস্কর'-এর। তারা নতজানু হয়নি। ফলে 'দৈনিক ভাস্কর'-এর অফিসে ইডি, আইটি প্রভৃতি সরকারী সংস্থার অভিযান শুরু হল। এখনও তারা আয়কর বিভাগ ইত্যাদির দারুণ আক্রমণের মুখে। সবাই এরকম সাহসিকতা দেখাতে পারেনি, অনেকে ভয় পেয়েছে এবং অনেকে আবার অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করার জন্য উদগ্রীব।

২০০ বছরের আগের সাংবাদিকতার সঙ্গে আজকের সাংবদিকতার তফাত কোথায়? সাংবাদিকতা এবং মিডিয়া এক নয়। যদিও কখনও কখনও তারা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। মিডিয়া প্রাতিষ্ঠানিক। ৬০-৭০-৮০-৯০- এর দশকে ব্যবসায়ী এবং কর্পোরেটদের পক্ষে মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে বামপন্থীরা, প্রগতিশীলরা সোচ্চার ছিলেন। এখন আর মিডিয়াকে ব্যবসায়ী বা কর্পোরেটদের পক্ষে বলে নিন্দা করা যাবে না, মিডিয়া নিজেই কর্পোরেট, বৃহৎ কর্পোরেট, দানবীয় কর্পোরেট। এখন তাদের ভূমিকা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়, মুনাফালোভী কর্পোরেশন হিসাবে এখন তাদের ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

আপনারা জানেন, এখন বলা হয় 'এম অ্যান্ড ই ইন্ডাস্ট্রি—মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি'। সাংবাদিকতা, মিডিয়া শিল্পের জগৎ এবং বিনোদন শিল্পজগৎ মিলেমিশে একাকার। যে কারণে সলমান খানের কৃষ্ণসার হরিণ শিকার মামলা খবর হয়েছিল, সেকি কৃষ্ণসার হরিণের দরদের জন্য? না, সলমান খান আইডল বলে সবাই ঐ খবরে আকৃষ্ট হবে তাই খবর করা হয়েছিল। বর্তমানে এই মিডিয়া শিল্পের অর্থমূল্য কত? অতিমারিতে দারুণ ক্ষতি হবার পরেও এবছর ভারতের মিডিয়া-বিনোদন শিল্পের ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.৮ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২৪ সাল অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচনের বছরে হবে ২.৩২ লক্ষ কোটি টাকা। এটা শিল্পজগতের নিজস্ব হিসেব। মিডিয়া শিল্পের সিএজিআর বা যৌগিক বার্ষিক বৃদ্ধির হার কত? শতকরা ১৩ ভাগ। এর মানে ২.৩২ লক্ষ কোটি টাকা ছ'বছরে দ্বিগুণ হবে। এটি একটি সুবিশাল শিল্প। কে ভারতে মিডিয়া শিল্পে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি? আগে ছিলেন আম্বানি, এখন আদানি তাকে ছাড়িয়ে গেছেন। এখন আদানি সব কোম্পানি কিনে নিচ্ছেন। গত কয়েক দশক আম্বানি ছিলেন দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনীদের অন্যতম এবং এদেশের মিডিয়া শিল্পেরও সবচেয়ে বেশি অংশের মালিক। আপনারা যে ই-টিভি বাংলা চ্যানেল দেখেন তার মালিক মুকেশ আম্বানি। শুধুমাত্র কর্ণাটকের চারটি চ্যানেল ইনাডু কোম্পানির হাতে আছে। গত ১৫ বছর ধরে ইটিভির বাকি সব ভাষার চ্যানেল—ইটিভি তামিল, ইটিভি গুজরাটি, ইটিভি ওড়িয়া, ইটিভি পাঞ্জাবি, ইটিভি মারাঠি ইত্যাদি—রয়েছে আম্বানির মালিকানায়। তার নিজের কত চ্যানেল আছে তিনি নিজেও বোধহয় হিসেব রাখেন না। যে মিডিয়াতে তিনি মালিক নন সেখানে তিনি সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপনদাতা। এটা মিডিয়ার সঙ্গে আঁতাত করে চলার অন্য একটি পদ্ধতি।

এক কথায় ভালো সাংবাদিকতার সংজ্ঞা কী? ভালো সাংবাদিকতা হল সেটাই যা সমকালের প্রধান সামাজিক প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। আমাদের সময়ে প্রধান প্রক্রিয়াগুলো কী কী? প্রথমত, অসাম্য। সাম্প্রদায়িকতার ফলাফলও শেষ পর্যন্ত অসাম্য বৃদ্ধির দিকেই নিয়ে যায়। কোভিড-১৯, কৃষি সমস্যার মত প্রধান বিষয়গুলো সংবাদপত্র, পত্রিকা, সাংবাদিকতা, লেখালেখির সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে যে কিভাবে তারা এই প্রসঙ্গগুলিকে ধারণ করবে। ইতিহাসের দিকে তাকালেও তাই দেখা যায় বহু বিভ্রান্তিকর বিষয় আছে। আমি দেখেছি বহু বইতে লেখা হয়েছে বাংলায় মহাদুর্ভিক্ষ হয়েছিল ১৯৪৩ সালে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৯৪২ সাল থেকেই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তাহলে ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল কেন বলা হয়? কারণ 'দ্য স্টেটসম্যান' ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের খবর করা শুরু করেছিল। কিন্তু বহু গোপনে* প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্রে, কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্রে ১৯৪২ সালেই দুর্ভিক্ষের খবর প্রকাশ পায়। *(*দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সময় থেকে ভারত রক্ষা আইন, ১৯৩৯ চালু ছিল যার অংশ ছিল সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণবিধি। সেই পরিস্থিতিতে গোপনে ব্রিটিশবিরোধী সংবাদপত্র প্রকাশিত হত।—সম্পাদকমণ্ডলী)* 'চার্চিলস্ সিক্রেট ওয়ার' বইতে মধুশ্রী মুখার্জি একটি অধ্যায়ে লিখেছেন বাংলা সংবাদপত্রের জগৎ কিভাবে দুর্ভিক্ষের খবর প্রকাশ্যে এনেছিল। কয়েক দশক বাদে স্টেটসম্যানের সম্পাদক লিখেছিলেন—''হ্যাঁ, আমরা দেরী করেছিলাম।'' কারণ তারা ভরসা রেখেছিল ব্রিটিশ প্রশাসন সমস্যার সমাধান করবে।

বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা কৃষি সংকট, কৃষি আইন। একটি বড় সংবাদপত্রের নাম করুন যারা বলেছে কৃষি আইনে কি ভয়ঙ্কর বিষয় রয়েছে। বরং তারা গদগদ ভাব প্রকাশ করেছে। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' কী করেছে? তারা নাকি 'জার্নালিজম অফ কারেজ' বলে নিজেদের বিজ্ঞাপিত করে! 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'—প্রতিষ্ঠানের কতটা লেজুড় হয়ে থাকা যায় তার উদাহরণ। ১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহের সময়ে 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র যেসব সম্পাদকীয় বেরিয়েছিল সেগুলি আবার বের করলে দেখা যাবে মুম্বাইয়ের রাস্তায় লড়াকু সৈনিকদের সম্বন্ধে কি লেখা হয়েছিল—গুন্ডা, ডাকাত, ঠগ, পিন্ডারি এইসব বলা হয়েছিল। ইভনিং মেল ইত্যাদি অধিকাংশ বড় বড় সংবাদপত্র আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এইভাবে আক্রমণ করেছিল। বড় সংবাদপত্রগুলোকে একই রকম ভূমিকা নিতে দেখা গেল ২০২১-২২ সালেও কৃষি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়ে। আপনারা কি কেউ দেখেছেন কোনো বড় কর্পোরেট খবরের কাগজ, কোনো কর্পোরেট বা সরকারী টিভি চ্যানেল বা তাদের কোনো ওয়েবসাইট তিনটি কৃষি আইনের সম্পূর্ণ বয়ান প্রকাশ করেছে? কেন তারা এটা প্রকাশ করল না? এই আইন শুধু কৃষকদের সম্পর্কিত নয়, এতে এমন কিছু ধারা আছে যেগুলি কর্নাটকে গোহত্যা বিরোধী অধ্যাদেশে ব্যবহার করা হয়েছে। এপিএনসি আইন (এগ্রিকালচার প্রোডিউস মার্কেটিং রেগুলেশন অ্যাক্ট) এবং চুক্তি চাষ আইন—এই দুটিতেই বলা হয়েছে, প্রথমত, এই বিষয়গুলিতে কর্পোরেটদের সঙ্গে কৃষকদের বিরোধ আদালতের আওতার বাইরে থাকবে। মূলত দেওয়ানী আদালতের এক্তিয়ারকে খর্ব করা হয়েছে। বলা হয়েছে এই সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে শুনানি হবে না, অ্যাপেলেট ট্রাইবুনালে বিচার হবে। ট্রাইব্যুনালে বিচার করবেন কালেক্টর, ডেপুটি কালেক্টর, তহশিলদার প্রভৃতিরা। তারা মুকেশ আম্বানি, আদানিদের কথা অনুযায়ী কাজ করবেন না?

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় / রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয়/ রাজ্য সরকারের কোনো অফিসারের বিরুদ্ধে এই বিষয়ে কোনো অভিযোগে মামলা করা যাবে না। ফলে এক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। যে কোনো সংবিধান বিশেষজ্ঞ বলবেন ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের মধ্যে তিনটি প্রধান মৌলিক অধিকারের অন্যতম হল ৩২ নং ধারায় উল্লিখিত আইনী প্রতিকারের অধিকার, কোর্টে যাবার অধিকার। সেই গণতন্ত্রের অর্থ কি যেখানে একজন নাগরিক কোনো বিষয়ের বিরুদ্ধে গিয়ে আদালতের মীমাংসা দাবি করতে পারেন না? গণতন্ত্রের মর্মবস্তু এখানে আক্রান্ত।

তৃতীয় বিষয়টি আরও আশ্চর্যজনক। বলা হয়েছে যারা 'সরল বিশ্বাসে' এই আইন মোতাবেক কাজ করবে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না। আদানি, আম্বানিরা সরল বিশ্বাসে কাজ করছেন! তাহলে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে, কে সরল বিশ্বাসে কাজ করেছে সেটা সরকার ঠিক করবে! কারণ আপনি তো কোর্টে যেতে পারছেন না। এই বিষয়টা একের পর এক আইনে ঢোকানো হচ্ছে। অথচ মিডিয়া এইবিষয়ে কিছু বলছে না। কেন? কর্নাটকে গোহত্যা নিষিদ্ধকরণ আইনে ১৭ নং উপধারায় বলা হয়েছে—যারা নিজেরা স্বাধীনভাবে সরল বিশ্বাসে এই আইন অনুযায়ী কাজ করবে তারা সরকারী কাজ করছে ধরে নেওয়া হবে। বিভিন্ন জায়গায় গোমাংস ভক্ষণকারীদের পিটিয়ে হত্যার ঘটনা আপনারা জানেন। বোঝাই যাচ্ছে বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জন্য এই আইন করা হয়েছে। আপনার বাড়ি লুঠ করা হবে, জ্বালিয়ে দেওয়া হবে, আপনার পরিবার নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে, কিন্তু যেহেতু সরল বিশ্বাসে করা হয়েছে, তাই কিছুই হবে না। কোনো প্রমাণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। একজন সাব-ইন্সপেক্টর স্তরের একজন আপনার বাড়িতে ওয়ারেন্ট ছাড়াই আসতে পারেন! বোঝাই যাচ্ছে কৃষি আইনের মধ্যে দিয়ে তারা কি করতে চায়, ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক পুনর্লিখন কেন করতে চায়।

আমার ৪২ বছরের সাংবাদিক জীবনের ৩০ বছর ধরে আমি এই বিতর্ক করে আসছি যে, ভারতীয় মিডিয়া রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন কিন্তু মুনাফার কারাগারে বন্দী। সময় পাল্টেছে। এখনও ভারতীয় সাংবাদিকরা মুনাফার কারাগারে বন্দী কিন্তু উত্তরোত্তর তাদের রাজনৈতিক 'বন্দিত্ব' বেড়ে চলেছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এবার একটি কথা বলব , কোনো বড় সংবাদপত্র যা নিয়ে বিশদে লেখার প্রয়োজন বোধ করেনি। বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা সূচক (ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স)-এ পৃথিবীর ১৭৮ টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান চার বছর আগে ছিল ১৩৯ তম। ২০২১ সালে তা নেমে এল ১৪২ তম স্থানে এবং ২০২২ সালে তা হয়েছে ১৫০ তম। গণতান্ত্রিক ভারতের এই অবস্থানে এদেশে গণতন্ত্রের অবস্থা প্রকট হচ্ছে। এই সূচকের কাজটা করে প্যারিস থেকে পরিচালিত রিপোর্টারদের একটি সংস্থা—'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স' (রিপোর্টারস্ স্যাঁ ফ্রঁতিয়রস্)। ২০২১ সালে ভারতের স্থান ১৪২-এ নেমে আসায় ভারত সরকার খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে, যদিও তিনদিন আগেই তাদের একজন মন্ত্রী বলেছেন, আমরা এই র‍্যাঙ্কিং বিষয়ে সহমত নই। ততদিনে র‍্যাঙ্ক ১৫০-এ নেমে গেছে। ভারতের স্থান ১৪২-এ নেমে আসার পর সরকার জবাব দেবার জন্য একটি কমিটি তৈরি করে। কোনো কিছু ধামাচাপা দেবার জন্য এরকম কমিটি করাই রীতি! এক্ষেত্রেও একটি কমিটি তৈরি করা দরকার ছিল যে কমিটি সবকিছু পর্যালোচনা করে বলবে যে র‍্যাঙ্কিংয়ে পদ্ধতিগত এবং আরও নানা রকম ত্রুটি আছে। কমিটির ১৩ জনের মধ্য ১১ জন সরকারী আমলা, ২ জন সরকারী প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশনের গবেষক, তারাও এক অর্থে সরকারী কর্মচারীই। এর সঙ্গে তারা ২ জন সাংবাদিককেও ডেকেছিলেন যাদের মধ্য একজন ছিলাম আমি। এই ইনডেক্স মনিটরিং কমিটি নিয়োগ করেন কেন্দ্রের ক্যাবিনেট সেক্রেটারি। তিনি ভারতের সবচেয়ে ক্ষমতাবান আমলা এবং তিনি শুধুমাত্র দু'জনের নির্দেশ মেনে চলেন। সবাই বুঝতে পারছেন সেই দুজন কে! (তাদের খবর সমস্ত সংবাদপত্রে ছাপা হয়, টিভি চ্যানেলে সারাদিন ধরে তাদের দেখা যায়।) প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর ডেপুটি জেনারেল প্রমুখ নানা অতিউচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি তৈরি হয়েছিল। যে দুজন সাংবাদিক ছিলেন তাদের একজন কোনোদিন কোনো কথা বলেননি, অপরজন আমি। কমিটির সমস্ত সভায় আমিই কথা বলে যেতাম আর অন্যরা মাথা নেড়ে বলতেন, 'খুব সত্যি কথা'। কি ঘটতে যাচ্ছে আমি খুব ভালো জানতাম। আমি যে নীতি নিয়ে চলি তা হল সরকারের সঙ্গে কাজ করো, কিন্তু সরকারের হয়ে কাজ কোরো না। সরকারের হয়ে সাংবাদিকরা কাজ করলে বিপর্যয়কর হয় এটা প্রমাণিত।

মৌলালী যুবকেন্দ্রের প্রবেশদ্বার

যখন আমাকে যখন কমিটিতে ডাকা হল আমি একটা শর্ত রেখেছিলাম যে আমাদের দেশের কিছু সুবিধাভোগী সংস্থা না বরং যেসব সাংবাদিক দেশের ভেতরের অবস্থাটা প্রত্যক্ষ করছে, যারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অভাব বোধ করছে, তাদের মতামত নিতে হবে। কমিটির নাম থেকেই মনে হচ্ছে শুধু 'রিপোর্টার্স্ উইদাউট বর্ডার্স'য়ের র‍্যাঙ্কিংয়ের জবাব খাড়া করার জন্যই এটা করা হয়েছে। প্রথম সভাতেই আমি আমার আপত্তি লিপিবদ্ধ করালাম। পুরো কমিটি যখন তৈরি হল দেখা গেল সার দিয়ে বহু 'সদগুরু'কে সেখানে রাখা হয়েছে। একজন সদগুরু ভারতের কোন কোন আইনের জন্য মিডিয়ার কাজ করতে অসুবিধে হচ্ছে তার একটা তালিকা দিলেন। সংখ্যাটা ৫২। সেখানে এই সরকার যে আইনগুলি প্রয়োগ করছে সেগুলি নেই। যেমন, ডিজিজ, প্লেগ, এপিডেমিক অ্যাক্ট, ডিজাস্টার্স অ্যাক্ট। আরেক মহম্মদ জুবেইর (যার কথা আগে বলা হয়েছে তিনি নন) আত্মহত্যা করেন ক্রমাগত সরকারের কাছে হয়রানির শিকার হয়ে। কী করেছিলেন তিনি? তিনি কোভিড আক্রান্ত এক ব্যক্তির সঙ্গে কোয়ারেন্টাইনে থাকা তার পরিবারের সদস্যদের টেলিফোনে কথপোকথনের ভিত্তিতে সংবাদপত্রে একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন। এর জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কোনো সংবাদপত্র প্রতিবাদ করেনি। শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মহত্যা করেন।

কমিটির প্রথমদিনের সভাতেই আমি বলেছিলাম, আমাদের নিজেদের মেথডোলজি অনুযায়ী তাহলে বিচার করা যাক যে প্রকৃত অবস্থাটা কি। এবিষয়ে কেউ কোনো কথা বললেন না, কারণ তারা বেশিরভাগই সরকারী আমলা, দু-একজন একটু সহানুভূতি জানালেন। অপর সাংবাদিক রজত শর্মা দুদিন পরে ব্যস্ত থাকার কথা জানিয়ে বিদায় নিলেন। তার জায়গায় আরও দুজন এলেন। তারাও নিশ্চুপ রইলেন। এরপর খসড়া রিপোর্ট পেশ করা হল। দেখা গেল আমার যে যে কথায় তারা সবাই সহমত হয়েছিলেন সেসব কিছুই সেই খসড়ায় নেই। দ্বিতীয়ত, ভয়ঙ্কর সব কথা লেখা হয়েছে, যেমন কাশ্মীরে সাংবাদিকরা যাতে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য সশস্ত্র বাহিনী বীরোচিত ভূমিকা পালন করেছে। তৃতীয়ত, সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হল, খসড়া রিপোর্টে মলাট থেকে শুরু করে ভেতরে কোথাও 'খসড়া' শব্দটিই নেই এবং প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদ শুরু হচ্ছে 'পি সাইনাথের প্রতি অশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা' জানিয়ে! আমি তখন আমার নিজস্ব পৃথক মতামত দিয়ে রিপোর্টের ওপর অসম্মতি নথিবদ্ধ করলাম। বলে রাখা দরকার, আগেও বহু সরকারী কমিটির ক্ষেত্রেই আমি তা করেছি, যেমন, মনমোহন সিংয়ের সময়ে 'বিপিএল সেন্সাস কমিটি'তেও করেছিলাম। যারা নিজেদের কথা বলতে পারে না তাদের হয়ে কাউকে না কাউকে তো বলতেই হবে! আমি নোট পাঠানোর পর কী হল? কমিটিটাই অদৃশ্য হয়ে গেল! ইন্টারনেটে, ইমেলে কোথাও আর তার হদিশ পাওয়া গেল না। আমি তিনবার নোট পাঠিয়েছিলাম। একবার নোটের প্রাপ্তি স্বীকার করে নোটটি সংশ্লিষ্ট সবাইকে পাঠানো হবে বলা হলেও কিছুই হয়নি। কমিটিটাই নিখোঁজ হয়ে গেল ! আমার এক বন্ধুকে বলেছিলাম, এই ভেবে কৃতজ্ঞ থাকো যে অন্তত সাংবাদিকরা নিখোঁজ হয়ে যায়নি। এরপর আরটিআই করা হয়েছিল। মোট ৯টি প্রশ্ন ছিল। ১ নং প্রশ্নের উত্তরে জানানো হয়েছিল কত নম্বর আদেশনামা অনুযায়ী কমিটি গঠন হয়েছিল, কমিটির সদস্যরা সংখ্যায় কত, কটি সভা হয়েছে ইত্যাদি। তারপরের ২ নং থেকে ৯ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হল—'এগুলি আমাদের দপ্তরের বিষয় নয়'। জরুরী অবস্থার সময়েও এরকম ঘটনা ঘটেছে বলে কখনও শুনিনি।

১২ এপ্রিল, ২২-এ ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান কংগ্রেসে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এরকম পরিস্থিতিতে রামমোহন রায় কি করতেন? ভগৎ সিং কী করতেন? আমাদের দেশের সাংবদিকতার ২০০ বছরের ইতিহাসে অন্তত ১৬০ বছরের অত্যন্ত গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। কারা ছিলেন সেই গৌরবের অংশ? রামমোহন রায়, মহাত্মা গান্ধী, বি আর আম্বেদকর—এঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকদের অন্যতম। এবং ভগৎ সিং—। আমার রাগ হয় যে ভগৎ সিংয়ের সাংবাদিক পরিচয় নিয়ে কেউ বলে না, এমনকি পাঞ্জাবেও না। ভগৎ সিং বিপ্লবী ছিলেন, শহীদ হয়েছিলেন সবই ঠিক, কিন্তু তিনি একজন পেশাদার সাংবাদিক ছিলেন। আমি এমন কোনো সাংবাদিক জানি না যিনি ভগৎ সিংয়ের মতো একই সঙ্গে চারটি ভাষায় ক্রমাগত লিখেছেন—উর্দু, পাঞ্জাবি, হিন্দি, ইংরাজি। অনুবাদ নয়, মৌলিক লেখা লিখেছেন। রামমোহনের ক্ষেত্রে বলা যায় তিনি নিজের অনেক মূল লেখা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করেছেন। ভগৎ সিং আকালি, কীর্তি, বীর প্রতাপ, অর্জুন প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতেন। কলকাতা শহরে আত্মগোপনে থাকার সময়ে তিনি নানা ছদ্মনামেও লিখতেন এখানকার বহু পত্রপত্রিকায়। এমনকি তিনি বাংলা শিখেছিলেন এবং বাংলাতেও কিছু কিছু লেখার চেষ্টা করেছিলেন। জেলে বন্দী থাকার সময়ে ঐ ২৩ বছরের যুবক পঞ্চম একটি ভাষা শিখেছিলেন—ফার্সি এবং সেই ভাষায় লিখতে শুরু করেছিলেন। ২৭০ দিন কারাবাসের সময়ে ৩১২ টি বই পড়েছিলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে বই দেওয়া বন্ধ করে দিলে তিনি অনশন ধর্মঘট শুরু করেন, শেষে তাঁকে বই পড়ার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি পাঁচটি ভাষা শিখে তাতে স্বাধীনভাবে লিখে গেছেন। তাঁর প্রায় হাজার খানেক রচনা আছে, সবটা এখনও জানা যায়নি। গবেষকরা বিস্মিত হয়ে দেখেছেন জেলখানায় বসে যে বইগুলি তিনি পড়েছিলেন তাতে পাতায় পাতায় অজস্র নোট, রেফারেন্স করা রয়েছে। অবাক হতে হয় যে মাত্র ২৩ বছর বয়সকালের মধ্যেই তিনি এতসব করে ফেলেছেন, কারণ তারপর তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়! আর আমি সাংবাদিকতা শুরুই করেছি ২৩ বছরে। আমরা আমাদের জীবন বা পেশা নিয়ে কী বা কতটুকু করছি?

তখনকার থেকে এখনকার সময়ের সংবাদপত্রের ফারাক কোথায়? ফারাক হয়েছে কার হাতে মিডিয়ার মালিকানা তাতে। ফারাক মিডিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠার মধ্যে। শুরুতে সংবাদপত্রের মালিক হতেন বিভিন্ন ব্যক্তি বা কোনো কোনো পরিবার। যেমন, রামমোহন রায় ছিলেন একজন ব্যক্তি মালিক। তামিলনাড়ুর হিন্দু পরিবার, কস্তুরী পরিবার সংবাদপত্রের মালিক ছিল। স্বাধীনতার পর পুঁজিবাদ যখন বৃহদাকারে প্রসারিত হচ্ছে তখন সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও তার হাত পড়ল। আমাদের মিডিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের সন্তান। ১৯২৩ সালে ভগৎ সিং ক্ষুব্ধ হয়ে সংবাদপত্রের সাম্প্রদায়িকীকরণ নিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, বহু নেতার এবং সংবাদপত্রের উস্কানি পরিস্থিতিকে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছিল। এখন চ্যানেলের পর চ্যানেলে মুসলিমবিরোধী ঘৃণার প্রচার চলছে, হিস্টিরিয়া তৈরি করছে। দ্বিতীয়ত, ৬০-৭০ দশক থেকে সংবাদপত্রগুলি ব্যক্তি মালিকানা, পারিবারিক মালিকানা থেকে বড় বড় ব্যবসায়িক কোম্পানির মালিকানায় চলে যেতে শুরু করে। ৯০ দশকের পর ছোট ব্যবসায়ীদের হাতে বিচ্ছিন্নভাবে একটা দুটো পত্রিকার মালিকানা আর রইলো না। এরপর পুরোপুরি কর্পোরেট অধিকৃত মিডিয়া আত্মপ্রকাশ করে। আপনাদের অনুরোধ, 'মেন স্ট্রিম' মিডিয়া কথাটা বলবেন না। মিডিয়া নিজেই জনজীবনের মূল ধারাকে বাদ দিয়ে চলেছে। সংবাদপত্রের প্রথম পাতার শতকরা ০.৬৭ শতাংশ ব্যয় হয় গ্রামীণ সংবাদের জন্য। শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষের কথা তারা লেখে না। কেন তাদের মূল ধারার মিডিয়া বলা হবে? তারা প্রকৃত পক্ষে একটি সংকীর্ণ ধারা। কিন্তু তাদের ক্ষমতা অনেক বেশি, যাতে করে তারা বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ করায়ত্ত করতে পারে।

সংবাদপত্র শিল্পে যত বেশি করে কর্পোরেটাইজেশন হল তত বেশি সংখ্যক সংবাদপত্র শিল্প দেউলিয়া হয়ে গেল। তাদের সাহায্য করতে নেহরু নরিম্যান পয়েন্ট, বাহাদুর শাহ জাফর মার্গে দামী দামী জমি দিয়েছিলেন সংবাদপত্র এবং বিনোদন শিল্পকে। অর্থমূল্য ছিল প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে দিয়ে দানবীয় কর্পোরেটরা তৈরি হল।

কর্পোরেটদের বেড়ে ওঠার জন্য দরকার তাদের চাহিদার মান্যতা। উদ্ভাবন-আবিস্কার-জিনিয়াস কর্পোরেটরা চায় না। তাদের দরকার বশ্যতা। তারা চায় এক ছাঁচের হোক সব কিছু। সবকিছু হোক সমধর্মী। পাঞ্জাবে কেন ১৩৭ প্রজাতির গমের বীজ হবে? ৫ রকম বীজই যথেষ্ট। ১৩৭ রকম বীজের বাজার দখল করা সুবিধাজনক নয়। তাই কর্পোরেট একচেটিয়া পুঁজির থাকে সমসত্ত্বকরণের স্বাভাবিক তাগিদ।

এরপর শুরু হল ইন্টারনেটের সঙ্গে রোমাঞ্চকর যাত্রা। ৯০ দশকের পর থেকে তা ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে। আজকের 'সুপার ইনফরমেশন হাইওয়ে'র সমস্যা হল পদে পদে লুঠেরারা রয়েছে। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় একচেটিয়ারা হল ডিজিটাল একচেটিয়া। আকার-আয়তনে ডিজিটাল একচেটিয়া পুঁজি অন্য যেকোনো একচেটিয়া পুঁজির থেকে অনেক বড়। তেল শিল্পই হোক, বিমান শিল্পই হোক, পরিবহণ শিল্প, খনি শিল্প। অন্য যে কোনো ক্ষেত্রের একচেটিয়া পুঁজি ডিজিটাল একচেটিয়া পুঁজির তুলনীয় নয়। বরং তাদের কার্যপদ্ধতিও সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা কাজ করে সর্বসাধারণের পরিসরে, সর্বসাধারণের এলাকায়। আমার ৭০ হাজার ফলোয়ার থাকতে পারে ফেসবুকে, টুইটারে, কিন্তু আমি তাদের ২ শতাংশের কাছেও পৌঁছতে পারব না যদি আমি টুইটার এবং ফেসবুকে 'পেইড পোস্ট' না করি। পরের ২ শতাংশের জন্য আবার টাকা দিতে হবে। তার পরের ৫ শতাংশের জন্য আবার। এইভাবে চলবে।

● অষ্টম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সপ্তম পৃষ্ঠার পরে

কর্পোরেট পুঁজির গ্রাসে ভারতীয় মিডিয়া

এখানে আমার মেধার থেকে অ্যালগরিদম বেশি কার্যকরী। ডিজিটাল একচেটিয়া সবকিছুর থেকে আলাদা এই কারণে যে তারা আমাদের ব্যক্তিগত তথ্যের মালিক। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো একচেটিয়া, ধরা যাক, সংবাদপত্রের জগতের রুপার্ট মারডক, আপনার ব্যক্তিগত তথ্যের মালিক ছিল না। ডিজিটাল একচেটিয়া আপনার ব্যক্তিগত তথ্য পাচার করে, ব্যক্তিগত তথ্য থেকে থেকে লাভ করে। আপনার আধার আর একটি যাচ্ছেতাই সমস্যা। আপনি দিল্লিতে আধার দিয়ে কোনো অর্থকরী আদানপ্রদান করলে ছয়/সাত দিনের মধ্যে সিবিল* (*ঋণ তথ্য সংস্থা—ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড) মুম্বইতে ঐ তথ্য হাতে পেয়ে যাবে। এরকম কত কোম্পানি বা কর্পোরেশন আপনার আধার তথ্য পাচ্ছে আপনি জানেন না। সম্প্রতি স্বীকার করা হয়েছে যে তথ্যের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বিধিভঙ্গ হচ্ছে।

আজকাল অনেকেই ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। আমিও করি। আমাদের একটি ডিজিটাল প্রকাশনা রয়েছে। কিন্তু আপনি হয়তো নজর করেননি যে আপনি যদি আপনার ভাই বা বন্ধুকে ইমেলে লেখেন যে ব্রাজিলের সাওপাওলোতে ছুটি কাটাতে যাবেন, তাহলে আপনার ইনবক্সে সাও পাওলোর একের পর এক হোটেল, রিসর্ট, রেস্টুরেন্ট, টুরিস্ট স্পট ইত্যাদির বিজ্ঞাপন জড়ো হয়। আপনি যদি আমাজনে বই কেনেন, সঙ্গে সঙ্গে আরও কত বইয়ের সুপারিশ করে বিজ্ঞাপন আসতে থাকে? কারণ তাদের কাছে আপনার সব তথ্য আছে। অ্যালগরিদমও তাদের হাতে, আপনার তথ্যও তাদের হাতে। এ সমস্তই হচ্ছে বিপদের দিক। এদের হাতে রয়েছে অপরিসীম ক্ষমতা। মাত্র চারটি কোম্পানি অন্তর্জালে শাসন চালাচ্ছে। ব্যাপারটা যেন নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢোকার জন্য ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে টাকা দিতে হবে। এরা বেআইনী দখলদার। মনে রাখবেন আপনার তথ্য তাদের সম্পত্তি নয়।

প্রথমত, পৃথিবীতে মিডিয়ার একচেটিয়া কর্পোরেট পুঁজি এক একটি দৈত্য বিশেষ। দ্বিতীয়ত, ইতিহাসে ডিজিটাল মিডিয়ার একচেটিয়া কর্পোরেট পুঁজি এক নজিরবিহীন অভাবনীয় বিষয়। তৃতীয়ত, কর্পোরেট জগতে সবকিছু পরস্পর সংযুক্ত। ভারতের ক্ষেত্রে একে আমি বলি অ-প্রযুক্তিগত অভিসরণ (নন-টেকনোলজিকাল কনভারজেন্স)।

সবশেষে আদানি-আম্বানি এবং কৃষি আইন বিষয়ে একটি কথা বলব। যেসব সংবাদপত্র আদানি-আম্বানির নয়, তাদের মধ্যে একটি খবরের কাগজও কেন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে লিখল না যে এটা অন্যায়? ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস একাধিক সম্পাদকীয় লিখেছে এইবিষয়ে, যেগুলির বক্তব্য ছিল—সরকার সঠিকভাবে কৃষকদের অবহিত করেনি (সাংসদরাই তো অবহিত হননি!) অর্থাৎ অবহিত করেছিল কিন্তু সঠিকভাবে নয়—কৃষকদের সঙ্গে ভালো করে কথা বলা দরকার ছিল, যেন তারা নির্বোধ, বুঝিয়ে বললে গ্রামে ফিরে যাবে ইত্যাদি। এইসব আবর্জনা কিসের জন্য লেখা?

১৯৯১ সাল থেকে বেসরকারিকরণের সূত্রপাত হওয়ার পর থেকে যারা সবচেয়ে বেশি মুনাফা করেছে মিডিয়া মালিকরা তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ধনী দশ জনের মধ্যে আছে। আমি অন্য কোম্পানির সঙ্গে মিডিয়া কোম্পানিগুলির মুনাফার অনুপাতে আপনাদের চোখ রাখতে বলছি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, শ্রীযুক্ত আম্বানি এবং শ্রীযুক্ত আদানি অস্বাভাবিক ক্ষমতাবান এবং মিডিয়ার ওপর তাদের অবিশ্বাস্য প্রভাব। কৃষক আন্দোলনের সময়ে বিশেষ করে আম্বানির প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল, এখন আদানিও তাকে ধরে ফেলেছে।

একটি কথা আপনাদের কাছে জানতে চাইছি ,মিডিয়া কখনও আপনাদের জানিয়েছে সিঙ্ঘু, টিক্রি সব জায়গায় কৃষকরা যখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল, তখন তারা মুহুর্মুহু শ্লোগান দিচ্ছিল আম্বানি-আমদানির বিরুদ্ধে? কেন? আপনাদের বলি কর্পোরেট জগতের আইনজীবিরা ঐ আইনগুলির খসড়া করেছিল। তাই কর্পোরেটদের সরকার আলোচনায় ডাকবে তেমন ব্যাপার ছিল না। বরং যা হচ্ছে সরকারের সঙ্গে তারা সেটা আলোচনা করে নিয়েছিল।

২০২০-২১ সালে রিলায়েন্সকে বাদ দিয়েও আম্বানির ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল ৮৪৫০ কোটি ডলার যা পাঞ্জাবের এসজিডিপির (স্টেট গ্রস ডোমেস্টিক প্রডাক্ট) সমান। বর্তমানে আদানির সম্পত্তি ১১৬৫০ কোটি ডলার যা তাকে পৃথিবীর চতুর্থ ধনী ব্যক্তিতে পরিণত করেছে, তা হরিয়ানার এসজিডিপির থেকে অনেক বেশি। এই হচ্ছে মিডিয়ার কর্পোরেটাইজেশনের স্তর,অর্থশক্তি এই পর্যায়ে কাজ করছে। কেন তাহলে মিডিয়া এমন কিছু লিখবে যা তাদের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপনদাতা কোম্পানির মালিকের স্বার্থের পরিপন্থী? কোন বুদ্ধু আছে এমন? আমি যদি বিজ্ঞাপন-আয়ের মডেল অনুযায়ী কাজ করি আমি চুপ থাকব। পুঁজিবাদী মডেলের যুক্তি এভাবেই কাজ করে।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পরিচালকমন্ডলীতে কারা থাকেন সে সম্বন্ধে একটা বিষয়ে আমি বেশ অনেকদিন ধরে খেয়াল করে আসছি। সংবাদপত্রের পরিচালকমন্ডলীতে কোনো সাংবাদিক থাকেন না। 'দৈনিক জাগরণ', ভারতের সবচেয়ে বেশি প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্র, যার ৩৬ টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। যাহোক, 'ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ জার্নালিস্ট'য়ের সভাপতি আয়ারল্যান্ডের মানুষ, তিনি দৈনিক জাগরণের পরিচালকমন্ডলীতে আছেন। আমার সন্দেহ আছে, তিনি হিন্দি আদৌ জানেন কিনা। মজার ব্যাপার হল সংবাদপত্র, পত্রিকা, চ্যানেল সর্বত্র দেখা যায় পরিচালকমন্ডলীতে অন্য কর্পোরেশনের লোকেরা থাকেন। উদাহরণ, বিসিসিএল—টাইমস অফ ইন্ডিয়া যাদের সংবাদপত্র। আন্তর্জাতিক স্তরে সংবাদপত্র বা গ্লোবাল চ্যানেলের নেটওয়ার্কের পরিচালকমন্ডলীতে অস্ত্র শিল্পের লোকেরা থাকেন, নির্মাণ শিল্পের লোকেরা থাকেন, অ্যারোস্পেস শিল্পের লোকেরা থাকেন, বৃহৎ ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার লোকেরা থাকেন।

ভারতে কোভিডের প্রথম বছরে ভারত সরকারের হিসাব অনুযায়ী জিডিপির সংকোচন হয়েছিল শতকরা ৭.৭ ভাগ, যদিও অর্থনীতিবিদরা কেউ কেউ বলেছেন ১১ বা ১২ শতাংশ হতে পারে এই হার। কিন্তু এই সময়েই পৃথিবীর বিলিওনারদের তালিকায় ৪২ জন ভারতীয় ঢুকে পড়েছেন। ফোর্বসের ইতিহাসে কখনও এক বছরে এতজন বিলিওনিয়ার হয়নি। এর ফলে ভারতীয় বিলিওনিয়ারের সংখ্যা ৯৮ থেকে বেড়ে ১৪০ হল। যখন মানুষ ক্ষুধায় অনশনে ভুগছে তখন এই ১৪০ জন শতকোটিপতির মোট সম্পদ দ্বিগুণ হয়েছে। এক সপ্তাহ আগে চালের দামে জিএসটি বসানো হয়েছে! যে দেশ সারা পৃথিবীর মধ্যে পুষ্টির দিক থেকে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে সেখানে চালের দামের ওপর জিএসটি! কোথায় মিডিয়ার প্রতিবাদ? কোথায় সেই সম্পাদকীয় যা বলবে---যখন ক্ষুধাসূচকে ১৬০ টি দেশের মধ্যে ভারত ১১৬ তম স্থানে নেমে গেছে তখন চালে জিএসটি বসানো উন্মাদের কাজ? এই হচ্ছে মিডিয়ার অবস্থা।

জঘন্যতম কর্পোরেশন এবং কর্পোরেশন হিসাবে তাদের সঙ্গে মৌলবাদীদের গভীর যোগসাজস আছে। বিগত কয়েক বছরে দেখা যাচ্ছে, গরীব মানুষদের অর্থনৈতিক কাঠামোর বাইরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, শুধুমাত্র অবহেলা নয়,একেবারে কাঠামোগতভাবে বর্জন। প্রথমে কর্পোরেটরা মিডিয়ার অ্যাজেন্ডা হাইজ্যাক করেছিল, তারপর পুরো মিডিয়াকেই হাইজ্যাক করেছে।

মিডিয়া সংস্কৃতিকে কর্পোরেট সংস্কৃতিগ্রাস করেছে, তার সঙ্গে পাঠকের সংস্কৃতিও গ্রাস করেছে কর্পোরেট। ২০০২ সালে অধ্যাপক প্রভাত পট্টনায়েক 'এশিয়ার কলেজ অফ জার্নালিস্ট'-এ এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'দ্য মরাল ইউনিভার্স ইজ শিট'। তাদের কাছে কিছু আশা করা বৃথা কারণ মিডিয়ার বস্তুগত ভিত্তিটাই পুতিগন্ধময় হয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে এখন মিডিয়ার মালিক একজন 'গান্ধী' নন, এখন মালিক আম্বানি, বিড়লা। এখন মিডিয়া কর্পোরেটদের মতাদর্শের হাতিয়ার। এই যোগসাজস মিডিয়াকে মিথ্যার ওপর দাঁড় করিয়েছে। পেড নিউজের ঘটনা সেটা দেখিয়ে দেয়। ৯০ দশকের শেষদিক নাগাদ বহু মিডিয়া তাদের সম্পদ শেয়ার বাজারে খাটাতে শুরু করে এবং বিজ্ঞাপন দাতারা তাদের শেয়ারে টাকা ঢালতে থাকে। যখন ওয়াল স্ট্রিটের পতন হয়, তখন সব জলে যায়। হিন্দুস্থান টাইমসের মত সংবাদপত্রেরও সে সময়ে বিপুল ক্ষতি হয়, যা অতীতে কোনোদিন হয়নি। এরপর 'পেইড নিউজ'কে টাকা আয়ের বিকল্প উপায় হিসাবে ব্যবহার শুরু হয়।

অস্ট্রেলিয়ান সমাজবিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ক্যারি ২০০১ সালে বিংশ শতাব্দীকে তিনটি কথায় ব্যাখ্যা করেছিলেন—১। গণতন্ত্রের উত্থান ও বৃদ্ধি, ২। কর্পোরেট শক্তির উত্থান ও বৃদ্ধি এবং ৩। গণতন্ত্রের উত্থান ও বৃদ্ধিকে ভূপতিত করার জন্য কর্পোরেট প্রচারযন্ত্রের উত্থান ও বৃদ্ধি।

স্বাধীনতার ৭৫ বছরে আমাদের বেছে নিতে হবে কোথায় আমরা থাকব, যুক্তির প্রজাতন্ত্রে না যুক্তহীনতার প্রজাতন্ত্রে, হিংস্রতার প্রজাতন্ত্রে? তাকিয়ে দেখুন কাদের হত্যা করছে মৌলবাদীরা? তারা যুক্তিবাদীরাই লক্ষ্য করে আক্রমণ করছে। কারণ একমাত্র যুক্তিবাদীদেরাই তাদের হাত থেকে খেলা ছিনিয়ে নিয়ে তাদের পরাস্ত করতে পারে। একের পর এক খুন হওয়া বুদ্ধিজীবিদের তালিকা দেখুন—নরেন্দ্র দাভোলকার,সিপিআইয়ের কমরেড গোবিন্দ পানসারে, এম এন কালবুর্গি, গৌরী লঙ্কেশ। এই তালিকায় প্রত্যেকের মধ্যে কোথায় মিল রয়েছে? তিনটি মিল আছে। ১। এরা সবাই যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদ। নরেন্দ্র দাভোলকার তাঁর সারা জীবন ব্যয় করেছেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে। কিন্তু আজকে কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলন তার শক্তি এবং ধারাবাহিকতা হারিয়েছে। ২। এটা খুব উল্লেখযোগ্য যে তারা সবাই কোনো না কোনো ভারতীয় ভাষায় লিখতেন। সেজন্য তাদের যারা ইংরেজীতে লেখেন তাঁদের থেকে বেশি ভয় পায় মৌলবাদীরা। যে কারণে ১৪ টি ভাষায় প্রকাশিত আর্কাইভস অফ রুরাল ইন্ডিয়ার ওপরও আক্রমণ হয়। নরেন্দ্র দাভোলকার, গৌরী লঙ্কেশ প্রমুখরা মারাঠা, কানাড়া প্রভৃতি ভাষায় লিখতেন। গৌরী ইংরাজীতেও লিখতেন, কিন্তু তিনি কানাড়ায় যা লিখতেন সেটার জন্যই তাঁর ওপর খুনীদের রাগ বেশি ছিল। ৩। তারা সবাই ছিলেন সাংবাদিক। নরেন্দ্র দাভোলকার ২৫ বছর ধরে একটি পত্রিকা চালাতেন। আমি জানি কারণ ঐ পত্রিকার ২৫ বছর পূর্তিতে আমাকে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। পত্রিকাটি যুক্তিবাদ প্রসারে এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইতে দায়বদ্ধ, মহারাষ্ট্রের আন্তশ্রদ্ধা নির্মূলন আন্দোলন সমিতির মুখপত্র। গোবিন্দ পানসারে ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, কমিউনিস্ট নেতা, ঐতিহাসিক, লেখক এবং সংবাদপত্রের নিয়মিত কলাম লেখক। ইতিহাসের এক অসামান্য বই 'শিবাজী কে?' লিখেছিলেন তিনি, যেজন্য মৌলবাদীরা তাঁকে ক্ষমা করেনি। কালবুর্গি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন এবং তিনিও ছিলেন একজন নিয়মিত কলাম লেখক। আর গৌরী ছিলেন একজন পেশাদার সাংবাদিক। এরাই হলেন আমাদের প্রকৃত মিডিয়া। সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ ক্রমশ আরও ঘনীভূত হচ্ছে। হয় নীরব থেকে অন্যায়ের সঙ্গে হাত মেলান, যেভাবে সংবাদপত্র ও মিডিয়া করেছে তিস্তা শীতলবাদ ও মহম্মদ জুবেইরের ওপর আক্রমণে চুপ থেকে, নয়তো ভিন্ন পথ সন্ধান করুন—বাংলার অতীত ঐতিহ্যের মধ্যেই তা আছে, প্রশ্ন করার, প্রতিরোধ করার, বিদ্রোহ করার, যুক্তির পথে চলার ঐতিহ্য। যখন দেশের এই অবস্থা, মিডিয়ার এই ভূমিকা তখন স্বাধীনতার ৭৫ বছরে আপনার পথ বেছে নিন। ১৯৪৯ সালে ২৫ নভেম্বর আম্বেদকর যে যুক্তির প্রজাতন্ত্রকে গণপরিষদের কাছে অর্পণ করেছিলেন সেই পথে যাবেন, নাকি সারনাথের তথাকথিত 'নতুন সিংহ'-এর মিথ্যা-স্থাপত্যে যে প্রজাতন্ত্র প্রতিফলিত হচ্ছে সেই—তা আপনাকে বেছে নিতে হবে। □

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পরে

একটি বামপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে

নেতৃত্বে গঠিত চীন বিরোধী 'কোয়াড' (Quad)-এর অন্যতম সদস্য ভারত। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জনকারী ভারত স্বাধীনতার ৭৫ বছরে সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়ে পরিণত হয়েছে।

নব্য উদার অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে দেশের কর্পোরেট পুঁজির পক্ষে সরাসরি দাঁড়িয়ে পরে, যার ফলে শ্রমিকদের দর কষাকষির ক্ষমতা ভয়ানকভাবে হ্রাস পায়। সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও কর্মসংস্থান ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। কৃষিতে উৎপাদন কমে যায় ভয়ানকভাবে। ১৯৮০ সালে বছরে মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদন ১৮০ কেজি থেকে ২০১২ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১৬৫ কেজিতে। এক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা সাব-সাহারান দেশগুলির থেকেও খারাপ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ উৎসা পট্টনায়েক ভারতকে বর্ণনা করেছেন Republic of Hunger---ক্ষুধার সাধারণতন্ত্র বলে। সর্বজনীন শিক্ষা, সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থা, সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থা—এসব থেকেই রাষ্ট্র হাত গুটিয়ে নিয়েছে। ফলে শ্রমজীবী মানুষ এর থেকে মুক্তি পাবার জন্য যখন প্রাণপণ চেষ্টা করছে তখন আর এস এস-এর পরিচালনায় বিজেপি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিয়ে জনগণের কাছে হাজির হয়েছে।

ভারতে নব্য উদার অর্থনীতি চালু হবার পরে ভারত রাষ্ট্রের চরিত্রের ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাষ্ট্রের দমন পীরন মূলক কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিগত ৪ বছরে। জাতীয় সংবিধানে প্রথম ধারাতেই India, that is Bharat, shall be a Union of States. অর্থাৎ ভারত হচ্ছে রাজ্য সমূহের যুক্তরাষ্ট্র। যদিও প্রথম থেকেই রাজ্যগুলির তুলনায় কেন্দ্র অনেক বেশি শক্তিশালী, তবুও সামান্য যেটুকু ক্ষমতা রাজ্যগুলির ছিল এই সময়কালে তাও প্রায় খর্ব হয়ে গেছে। রাজ্যের নিজস্ব কর আদায়ের যে ব্যবস্থা ছিল, জি এস টি-এর মাধ্যমে তা হরণ করে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি, যেমন কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগত নতুন নতুন আইন জারি করে চলেছে। তিনটি যে কেন্দ্রীয় কৃষি আইন, জাতীয় শিক্ষানীতি বিষয়ক কেন্দ্রীয় আইন এর উদাহরণ।

সংবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মোদি সরকার একের পর এক জনবিরোধী আইনগুলি পাশ করিয়ে নিচ্ছে নিয়মকানুন না মেনে। কৃষি বিলের উপর সিপিআই(এম)-এর সাংসদ কে কে রাকেশ ১১টি সংশোধনী আনেন এবং ডিভিশন (রেকর্ডেড) ভোটের দাবি জানান। কিন্তু রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ সিংহ ডিভিশন ভোটের দাবি অগ্রাহ্য করে ধ্বনি ভোটে বিল পাশ করান গাজোয়ারি করে। বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন প্রভৃতি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিও অনেকক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে নিয়মবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। সংবিধানের কোন ধারা বাতিল করা সংবিধান সম্মত কিনা—এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট মামলাই শুরু করতে পারেনি বিগত দুই বছর ধরে, অথচ অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের রায় দশ মাসের মধ্যেই ঘোষণা হয়ে যায়। একইভাবে নির্বাচনী কমিশনা শাসক দলের সুবিধা-অসুবিধা বিচার করে ভোটের দিন ঘোষণা করছে। ভোটে সাম্প্রদায়িকতা, জাত-পাতের ব্যাপক প্রচার চললেও নির্বাচন কমিশন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না। সাধারণভাবে এই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রশাসনের শাখায় পরিণত হচ্ছে, যা আদতে স্বৈরতন্ত্রের রাষ্ট্রের অশনী সংকেত।

ভারতে কর্পোরেট হিন্দুত্ব রাজ কায়েম করেছে যা আসলে নয়া ফ্যাসিবাদ। এই নয়া ফ্যাসিবাদ মানুষকে তার নিপীড়নের বস্তুগত ব্যাখ্যার বদলে, এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তার দুর্দশার জন্য দায়ি করে, তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা উগরে দিয়ে তাদের হত্যার নিদান দিয়ে ক্ষোভ প্রশমনের ব্যবস্থা করছে। ফলে একদিকে যেমন ধনী কর্পোরেট সম্প্রদায় সুরক্ষিত থেকে

নাগরিক অধিকারের পরিসরেও বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের দমনমূলক হস্তক্ষেপ এবং নজরদারি বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক অধিকার হরণ করার জন্য ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেই এন পি আর, এন আর সি, সি এ এ চালু করে দেশের এক বিশাল অংশের মানুষকে অবৈধ নাগরিক করে তোলার হিংস্র পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল বিজেপি। ইউ এ পি এ, এন এস এ প্রভৃতি আইনগুলি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এমনভাবে পরিবর্তন করেছে যে এই আইনে কোনো নাগরিক গ্রেপ্তার হলে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি দেশবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত নন। কার্যত নাগরিকদের বিরুদ্ধে একপ্রকার যুদ্ধই ঘোষণা করছে রাষ্ট্র। এই দানবীয় আইনগুলি সাম্প্রতিক সময়ে সি এ এ-এর বিরুদ্ধে শাহিনবাগে আন্দোলনরত মানুষের উপর, ভীমা-কোরেগাঁও ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। এমনকি ৮৪ বছর বয়সী পারকিনসন্স রোগে আক্রান্ত জেসুইট পাদরী, স্ট্যান স্বামী ইউ এ পি এ আইনে আটক হয়ে বিনা চিকিৎসায় জেলে মারা যাবার পরও হেলদোল নেই প্রশাসনের।

স্বাধীনতার সময় 'হিন্দুরাষ্ট্র' গড়ার স্বপ্ন অধরা থেকে গিয়েছিল আর এস এস-এর। সাভারকার ১৯২৩ সালে লেখেন —'Hindutua! Who is a Hindu?' সেখানে তিনি বলেন যে যাদের মাতৃভূমি, পিতৃভূমি এবং পূণ্যভূমি ভারতে অবস্থিত তারা হিন্দুত্ব-এর ধারণার অন্তর্গত। যেহেতু মুসলিমদের পূণ্যভূমি ভারতের বাইরে মক্কা-মদিনায়, তাই মুসলিমরা হিন্দুত্বের ধারণার মধ্যে পরে না। তাদের হয় ভারত ছেড়ে যেতে হবে। নয় তো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকতে হবে। সাভারকার আরও বলেন যে, হিন্দুত্ব একটি রাজনৈতিক প্রকল্প। এর সঙ্গে হিন্দুধর্মের কোনো যোগাযোগ নেই। যে ঐক্যবদ্ধ ভারতের কথা কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা বলেছিল, তার বিপ্রতীপে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত ভারতের কথা চিন্তা করেছিল আর এস এস এবং হিন্দু মহাসভা। এই সাভারকার আন্দামানে বন্দী থাকা অবস্থায় পাঁচ পাঁচবার ইংরেজ সরকারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে মুক্তির আবেদন জানিয়ে চিঠি লেখেন। ১৯৩৭ সালে আমেদাবাদে হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনিই সর্বপ্রথম ধর্মের ভিত্তিতে 'দ্বিজাতি' তত্ত্বের ঘোষণা করেন, মহম্মদ আলী জিন্নারও আগে। তিনি ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে হিন্দুদের যোগদানে নিষেধ করেন।

বিজেপি তার 'হিন্দু রাষ্ট্র' গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ভারতীয় সংবিধানকেই বাতিল করে দিতে চাইছে। তারা বলছে যে গণপরিষদের তৈরি সংবিধান তারা মানবে না। মনুসংহিতা হবে তাদের নতুন সংবিধান, বর্ণাশ্রম প্রথার ভিত্তিতে দেশ চালিত হবে। তারা এমনকি স্বাধীনতা দিবসকে পর্যন্ত অস্বীকার করতে চাইছে। তারা বলছেন যে প্রকৃত স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে ৫ আগস্ট। কারণ ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট ৩৭০ ধারা বাতিল করে ভারতের একমাত্র মুসলিম প্রধান রাজ্য জম্মু-কাশ্মীরকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং ২০২০ সালের ৫ আগস্ট রামমন্দিরের শিলান্যাস করা হয়েছে। এমনকি তাদের অনুগত সাধুরা দাবি তুলেছেন যে, স্বাধীনতা দিবসের দিন গেরুয়া পতাকা উত্তোলন করতে হবে। জাতীয় পতাকা নিয়ে এদের একটা অংশ ভারতের সংবিধানের মুখবন্ধ থেকে ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক শব্দদ্বয় তুলে দেবার জন্য কোর্টে মামলা করেছে। ফলে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষপূর্তির সময় স্বাধীনতা সংগ্রাম বিরোধী শক্তি বিজেপির হাতে দেশের স্বাধীনতাও বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

এই লেখার প্রথম দিকেই বলা হয়েছে রাষ্ট্র পরিচালিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়ে যায় দেশীয় বাজার সৃষ্টি করতে না পারার জন্য। এই দেশীয় বাজার তৈরি করতে দরকার আমূল ভূমি সংস্কার। আমুল ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়েই আমরা সমাজতান্ত্রিক ভারতের দিকে এগোতে পারব। তাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পূর্ণ বিকশিত করার জন্য আমূল ভূমি সংস্কারের সংগ্রাম হয়ে উঠুক স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষপূর্তির অঙ্গীকার।

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার ষড়যন্ত্রের মূল চক্রী হিসেবে বি ডি সাভারকারকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু রাজসাক্ষীর বক্তব্যের সাপেক্ষে প্রমাণ যোগাড় করতে না পারায় সাভারকার ছাড়া পেয়ে যান। মহাত্মা গান্ধীর হত্যার তদন্তে ১৯৬৫ সালে গঠিত জাস্টিস জীবনলাল কাপুর কমিটি তার রিপোর্টে বলে যে "All these facts taken together were desruetive of any theory other than the conspracy to murder by Savarkar and his group. গান্ধী হত্যার সংবাদে আর এস এস-এর দিল্লী সহ বিভিন্ন মণ্ডলে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছিল। ফলে গান্ধী হত্যার পরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আর এস এস-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ থেকে ১০ জুলাই ১৯৪৯ পর্যন্ত। আর এস এস নিষেধাজ্ঞা তোলার জন্য ঘোষণা করে যে তারা শুধু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকবে, কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকবে না। পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে আর এস এস তাদের ক্যাডার পাঠিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে ভারতীয় জনসংঘ নামক তীব্র দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল তৈরি করতে সাহায্য করে। এই ভারতীয় জনসংঘরেই পরবর্তী অবতার বর্তমান বিজেপি দল। সুতরাং বিজেপি হল আর এস এস-এর রাজনৈতিক শাখা, যারা স্বাধীনতার ৭৫ বছরে ভারতের রাষ্ট্র ক্ষমতা এবং তার অন্যান্য উপাঙ্গগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

ভারতের স্বাধীনতার সময় আর এস এস-এর 'হিন্দুরাষ্ট্র' গঠনের স্বপ্ন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সাধারণ জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতা সংগ্রামে কখনও অংশ না নেওয়া আর এস এস-এর রাজনৈতিক শাখা বিজেপি, নব্য উদার অর্থনীতির চাকায় নিষ্পেষিত জনসাধারণের মধ্যে তীব্র সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। লাভ-জিহাদ, আন্টি-রোমিও স্কোয়াড, গো-রক্ষা বাহিনী, বুলডোজার রাজনীতির মাধ্যমে তীব্র মুসলীম বিদ্বেষ তৈরি করে চলেছে বিজেপি। □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

সংগঠনের সর্বস্তরে সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে

পাদদেশ থেকে শিয়ালদহ বিগবাজার পর্যন্ত এক দৃপ্ত মিছিল সংগঠিত হয়, পরবর্তীতে বিগবাজারের সামনের সমাবেশে নেতৃত্বরা বক্তব্য রাখেন। এর পরে ১৪ জুলাই ২০২২ কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মচারী ভবনে স্বেচ্ছায় রক্তদান, মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদান অঙ্গীকারের শিবির অনুষ্ঠিত হয় ১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে। ৬ জন মহিলা সহ ১০২ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। প্রায় ১০০ জন কর্মী ও পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদানে অঙ্গীকার করেন। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট অভিনেতা দেবদূত ঘোষ।

আগামী কর্মসূচী বিষয়ে বলতে গিয়ে সাধারণ সম্পাদক বলেন সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি সভা আগামী ২৪ জুলাই ২০২২ কাউন্সিল সভা সমাপ্তির পর বিকাল ৩ ঘটিকায় মৌলালি যুবকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট সাংবাদিক পি. সাইনাথ। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী ১৫ আগস্ট ২০২২ স্বাধীনতা দিবসে কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মচারী ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক কর্মসূচী। সমিতি ও জেলাগুলির দপ্তরে জমায়েতের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও আলোচনা সভা সংগঠিত করতে হবে। আগামী ৩০ আগস্ট ২০২২ বর্তমান রাজ্য সরকারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সারা রাজ্যজুড়ে বকেয়া ৩১ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান সহ তিন দফা দাবিতে ২ ঘণ্টার কর্মবিরতি (বেলা ১১.৩০-১.৩০ পর্যন্ত) ব্যাজ পরিধান সহ দপ্তরে দপ্তরে প্রতিপালিত হবে। রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত ২৫টি সংগঠন এই ব্যাজ পরিধান ও কর্মবিরতির যৌথ সংগ্রামে সামিল হবে। এই মুহূর্তে সমকাজে সমবেতন, সর্বস্তরে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে স্থায়ী কর্মীর মতো সুযোগ, বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, রাজ্যের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার দাবিতে আমাদের সরাসরি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচীতে যেতে হবে। আগামী দিনে ২৫টি সংগঠন একযোগে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে। আমাদের প্রিয় সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ২০তম রাজ্য সম্মেলন জলপাইগুড়ি জেলায় আগামী ২৪-২৬ ডিসেম্বর '২০২২ কমরেড তরুণ মজুমদার নগর, কমরেড মলয় রায় নামাঙ্কিত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে কমরেড সত্যজিৎ রায় নামাঙ্কিত প্রগতিশীল বুক স্টল উদ্বোধন হবে ২৩ ডিসেম্বর ২০২২। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত তোরণ নির্মিত হবে জলপাইগুড়ি শহরে। রাজ্য সম্মেলন হচ্ছে সংগঠনের পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়া। বিগত ১৯তম রাজ্য সম্মেলনেও আমরা ব্লক থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়া সংগঠিত করেছিলাম। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই কাঠামোর সচলতা আমরা রক্ষা করতে পারিনি। এ দায় আমাদের, এ দায় নেতৃত্বের। সদস্য সংগ্রহ অভিযানকে যে ধারাবাহিকতা ও পেশাদারিত্ব নিয়ে আমাদের করার কথা ছিল তা নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে সর্বোচ্চ সফলতা পায়নি। বিভিন্ন স্তরে কাঠামোর গভীরতার প্রশ্নে সমিতগুলির স্থায়ী প্রতিনিধিদের ভূমিকার ঘাটতি ছিল। জেলাস্তর থেকেও নিয়মিত জীবন্ত যোগাযোগ রক্ষিত হয়নি। এ সমস্ত ঘাটতিকে কাটিয়ে সংগঠনের সর্বস্তরের পুনর্গঠনকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিতে হবে। আমরা পারব, কারণ আমাদের সংগঠন পরিচালিত হয় মতাদর্শের দ্বারা। সংগঠনের অষ্টম রাজ্য সম্মেলনে ঘোষিত সেই অমোঘ বার্তা—"দুনিয়া জোড়া শ্রেণীদ্বন্দ্বে আমরা নিরপেক্ষ নই, আমরা সমাজতন্ত্রের পক্ষে" আমাদের সংগঠন পরিচালনাকে আরও ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল, দৃপ্ত পথচলায় প্রেরণা জোগায়। কোভিড পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করেই আমরা সংগঠনকে সচল রেখেছি। কর্মচারী সমাজের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করে নিঃস্ব, ক্ষুধার্ত, কাজ হারানো মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত। নির্বাচনী বিপর্যয়ের পরও আমরা ব্লক সভা করেছি দার্জিলিং থেকে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত। আধিকারিকদের ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে সাগর থেকে পাহাড় পর্যন্ত। সঠিকভাবে সংগঠন পরিচালনা করলে কর্মচারীরা সারা দেন। কর্মচারীদের স্থানীয় স্তরের দাবি নিয়ে তাৎক্ষণিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। বিগত কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৪ নভেম্বর ২০২২ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে বকেয়া মহার্ঘভাতা সহ ৫ দফা দাবিতে জলপাইগুড়ি জেলায় কর্মচারী জমায়েতের কর্মসূচী হবে। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি জেলায় রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রচার প্রস্তুতি লক্ষ্য করে শাসকদলের অনুগামী সংগঠনের গাত্রদাহ হচ্ছে। তাই শাসকদলের নেতারা সংগঠন ভাঙার হুমকি দিচ্ছেন। জলপাইগুড়ি জেলার কর্মী-নেতৃত্ব সংগঠকদের অভিনন্দন। হুমকির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় একদিনের নোটিশে জেলা সদরজুড়ে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করে প্রতিক্রিয়াশীলদের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আসলে শাসকদল ভুলে গেছে, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পরিচালিত হয় তার শক্তিশালী মতাদর্শের দ্বারা। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করে কর্মচারী স্বার্থে একাই সঙ্গে শ্রমজীবী মেহনতী জনগণের স্বার্থে। তাই সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় থেকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকেই চেষ্টা করেছেন, হুঙ্কার ছুড়েছেন কিন্তু রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের প্রাণ প্রিয় সংগঠন তাকে ভাঙা যায়নি, ভবিষ্যতেও যাবে না। সংগঠনের পুনর্গঠনকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়ে প্রত্যেকটি কর্মচারীর কাছে পুনর্নির্মাণের বার্তা নিয়ে পৌঁছাতে হবে। তাই আমাদের কাজ---'টু রিচ দ্য আনরিচ'।

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনার পরবর্তীতে ২১টি জেলা ও কলকাতার ৭টি অঞ্চলের প্রতিনিধিরা তাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ ব্যক্ত করেন। সমস্ত আলোচনাকে সূত্রায়িত করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন, গোটা বিশ্ব জুড়েই বিভাজনের রাজীনতি চলছে। অর্থনৈতিক বিভাজন অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ভেঙে দিয়েছে। পৃথিবীর ১০ জন মানুষের মোট অর্থের পরিমাণ ৩১০ কোটি মানুষের মোট সম্পদের থেকে বেশি। এককথায় পুঁজির পুঞ্জিভভবন ঘটছে। বিত্তশালী ১০ জন মানুষ যদি বছরে ১০ লক্ষ ডলার করেও অর্থ খরচ করেন তবুও ৪১৪ বছর লাগবে বর্তমানে তাদের মোট সম্পদ ব্যয় করতে। অপরদিকে প্রতিদিন ২১৩০০ জন দূরাবস্থার কারণে মারা যাচ্ছেন। অক্সফ্যামের রিপোর্ট অনুযায়ী নিম্নমুখী আয় এ বছর আরও ৫ শতাংশ কমেছে। স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার প্রশ্নে, অধিকারগত দাবি দাওয়ার প্রশ্নে সম্মেলনের অভিমুখ আমাদের নির্ধারণ করতে হবে। ঊনবিংশতিতম থেকে এবারের সম্মেলনের পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। আক্রমণ কমেনি বরং বেড়েছে। আগামীর অভিমুখ নির্ধারণের প্রশ্নে আমাদের মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন শ্রমজীবী মানুষের শত্রুকে চিহ্নিত করে আমাদের লড়াই-আন্দোলনে ভূমিকা, একে মোকাবিলা করার প্রশ্নে প্রস্তুতি গ্রহণে আমরা কতটা অগ্রসর হতে পারলাম। আক্রান্ত হতে হতে ফুরিয়ে যাওয়া নয়, লড়াইয়ের মশালকে সঠিকভাবে প্রজ্জ্বলিত করতে হবে। স্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্ছে তাকে দাবানলে পরিণত করতে হবে। সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটছে, বিশেষত মুদ্রার বিবর্তন। সোনা-রূপা-ধাতু-নোট ডিজিটাল কারেন্সি থেকে ক্রিপটো কারেন্সি। অনলাইন শপিং এক নতুন পরিবর্তন। ক্রিপটো কারেন্সি মানে এক কথায় গোপন মুদ্রা, ১৪ লক্ষ মানুষ ব্যবহার করছেন। কোনো ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা থাকবে না, নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, আগে বলা হত পুঁজি ব্রেকফাস্ট আমেরিকায় করলে, লাঞ্চ সারে লন্ডনে আর নৈশাহার ভারতে। বর্তমান ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এখন পুঁজির এত সময়ও লাগবে না। স্বাভাবিকভাবেই আজকের যে বহুমাত্রিক আক্রমণ একে প্রতিহত করতে গেলে চাই বিকল্প ভাবনা, মানুষের হাতে অর্থ তুলে দেওয়া। কিন্তু দেশের সরকার শ্রমজীবী জনগণকে কিছুটা সহায়তা প্রদানের পরিবর্তে কর্পোরেটদেরকে সহায়তা করছেন। অগ্নিপথ প্রকল্পের মাধ্যমে চুক্তিতে সেনা নিয়োগ করতে চাইছেন। দেশের বর্তমান সরকারের সময়কালে মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার, সার্বভৌমত্ব, গণতান্ত্রিক অধিকার আক্রান্ত। আক্রান্ত দেশের সংবিধানও। দেশের আইনসভাও সংবিধানকে অবমাননা করার প্রক্রিয়া যুক্ত হয়েছে নতুন সংসদ ভবন নির্মানে। যেখানে অশোক স্তম্ভকে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। সংসদ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্যকে সেন্সর করা হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়নের একজন কর্মী নেতৃত্ব সংগঠক হিসাবে অবশ্যই অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া থাকবে, কিন্তু বামপন্থী মতাদর্শের একজন কর্মী-নেতৃত্ব সংগঠক হিসাবে আমাদের প্রধান কাজ দেশের আক্রান্ত ধর্মনিরপেক্ষপতা সংবিধান গণতন্ত্রকে রক্ষা করা। তাই স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতে সংগঠনের সিদ্ধান্ত সমস্ত সাংগঠনিক দপ্তরে দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে পুনরায় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের ভূমিকা প্রতিপালন করা বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করে স্তালিন বলেছিলেন—'বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পতাকা ভুলণ্ঠিত হলে শ্রমজীবীদের দায়িত্ব তাকে তুলে ধরা'—শ্রমজীবী মানুষের অংশ হিসাবে এ দায় এবং দায়িত্ব দুই-ই আমাদের। এসময়কালে আমরা বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মসূচী যেমন প্রতিপালন করছি একইভাবে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে রক্তদান, মরণোত্তর চক্ষু দান ও দেহদান কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হচ্ছে। ২০-২১ মে রাজপথে রাতজাগা কর্মসূচীর সাফল্যকে সংহত করে সারা রাত্রি ব্যাপী অবস্থানকারী কর্মচারীদের কাছে টেনে নিতে হবে। সংগঠনের পুনর্নির্মাণে তাদেরকে যুক্ত করতে হবে। কর্মচারীর ক্ষোভকে রাস্তায় নিয়ে আসা এ মুহূর্তে আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য। কর্মচারী মানে এ মুহূর্তের যা বাস্তবতা তাতে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীকে বাদ দিয়ে নয়, শাসকদল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করে কাজ করছে, BSK-দের মধ্য দিয়ে আউটসোর্সিং হচ্ছে। পঞ্চায়েত ও ব্লকস্তরের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মূল্যায়নের প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে আমাদের। এইচ আর এম এস, ডব্লু বি এইচ এস-এর ক্ষেত্রে সাংগঠনিক তৎপরতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। মানুষের দাবি নিয়ে আন্দোলন, স্থানীয় আদায়যোগ্য দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে সাফল্য না পাওয়া পর্যন্ত। ছোটো ছোটো ইস্যু নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন নেতিবাচক উপাদান থাকলেও ইতিবাচক উপাদানও রয়েছে। বিভিন্ন সমবায় নির্বাচনগুলিতে আমাদের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। বামপন্থীদের ইতিবাচক ভূমিকাকে তুলে ধরতে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করতে হবে। মুখপত্রের গ্রাহকভুক্তি বৃদ্ধি করার সাথে সাথে বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজকেও গুরুত্ব দিতে হবে। আগামী ৩০ আগস্টের কর্মবিরতির কর্মসূচী শুধুমাত্র আমাদের সংগঠনের আন্দোলন কর্মসূচীতে নয়, যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচীতেও ইতিহাস রচনা করবে। যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচী সাফল্যের রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত দাবিকে ঐক্যবদ্ধ রূপ দিতে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের দায়িত্ব সব অংশের মানুষ বিশেষত কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করা। প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ করতে হলে আমাদের ক্ষেত্রকেও আরও প্রসারিত করতে হবে। রাজ্যের গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই এ মুহূর্তের অন্যতম দায়িত্ব। একই সঙ্গে কর্মচারী সমাজকে সুরক্ষিত রাখটাও সংগঠনের দায়িত্ব। কোনো কোনো সময় দু-পা পিছিয়ে আসা মানে ভীরুতা নয়, আগামীতে আরও এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সংগঠনের পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে আমরা অগ্রসর হব। প্রতিটি স্তরের কাঠামোর পুনর্নির্মাণে সমিতিগুলিকেও সমদায়িত্ব প্রতিপালন করতে হবে। কাঠামোকে জীবন্ত রাখতে স্থায়ী প্রতিনিধিদের ভূমিকাকে প্রতিনিয়ত নার্সিং ও চেকআপ করতে হবে। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব নয়, সাহসিকতার সাথে কর্মচারী দরদী, প্রশাসনে দক্ষ, মতাদর্শে অবিচল আস্থা সম্পন্ন ও সদস্য বন্ধুদের প্রতি আন্তরিক, দায়বদ্ধ, গ্রহণযোগ্য প্রকৃত নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আসন্ন ২০তম রাজ্য সম্মেলন সাংগঠনিক পুনর্নির্মাণের সাথে সাথে রাজ্য তথা দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক কাঠামো, ধর্মনিরপেক্ষতা, সংবিধান রক্ষার্থে প্রকৃত ভূমিকা প্রতিপালন করবেই এই আত্মবিশ্বাস আমাদের রয়েছে।

সমস্ত আলোচনা এবং করণীয়কে উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যরা গ্রহণ করার পরবর্তীতে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে আশীষ ভট্টাচার্য কাউন্সিল সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

দেবাশীষ রায়

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের রাজ্যব্যাপী দু'ঘণ্টার কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ কর্মসূচী

প্রথামাফিক ঘোষিত ১০ শতাংশ ইন্টেরিম রিলিফকে কিছুদিন পরে ১০ শতাংশ মহার্ঘভাতা হিসেবে ঘোষণা করার মতো অপকৌশলও গ্রহণ করা হয়েছে।

ফলস্বরূপ একদিকে বকেয়া

পাহাড়ে কর্মবিরতিতে বিজয় শঙ্কর সিংহ ও রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়

মহার্ঘভাতার পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে (বর্তমান ৩১ শতাংশ), অন্যদিকে শ্রমিক কর্মচারী-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ক্ষোভের পারদও চড়েছে। খেলা-মেলা-উৎসবের নামে রাজ্য কোষাগারের অর্থ হরিরলুটের মতো যথেচ্ছ খরচ করা হয়েছে, অথচ মহার্ঘভাতার মতো ন্যায্য দাবি উপেক্ষিত হয়েছে। এর প্রতিবাদে শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সংগঠনগুলি কখনও এককভাবে, কখনও যৌথভাবে দাবি আদায়ের লক্ষে বিভিন্ন ধরনের আনদোলন-সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এমনকি প্রশাসনের সদর দপ্তর নবান্ন অভিযানও করা হয়েছে। সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের দিনগুলিতে মহার্ঘভাতার দাবিকে যুক্ত করে ধর্মঘটও পালন করেছেন কর্মচারী ও শিক্ষকরা। কিন্তু তারপরেও সরকারের টনক নড়েনি। বাম আমলে যেভাবে সহানুভূতির সাথে মহার্ঘভাতার দাবিকে বিবেচনা করা হত, বর্তমান সময়ে সেই সহানুভূতি তো দূরের কথা, বরং প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও অবমাননাকর মন্তব্য করা হয়েছে। প্রথমে স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল ও পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্ট বাম আমলে গঠিত রূপায়িত পঞ্চম বেতন কমিশনের মহার্ঘভাতাকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টিকে আইনী শিলমোহর দেওয়ার পরেও এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও সরকারের শিক্ষক-কর্মচারী

সহকর্মীদের সাথে যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

বিরোধী অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আদালতের রায়কে মান্যতা দেওয়ার বাধ্যবাধকতাও এই সরকার মানে না। স্বভাবতই ক্ষুব্ধ শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ২৫টি সংগঠন যৌথভাবে আজ (৩০ আগস্ট) ২ ঘণ্টার (বেলা ১১.৩০ মি. থেকে ১.৩০ মি.) কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

আহ্বায়ক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে মহার্ঘভাতার দাবির সাথে

লবণহ্রদ

সর্বস্তরে শূন্যপদে স্বচ্ছতার সাথে স্থায়ী নিয়োগ, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার দাবিকে যুক্ত করে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক প্রচার শুরু হওয়ার পরে আরও অনেকগুলি সংগঠন এই কর্মসূচীকে সমর্থন করে। শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যেও বিপুল সাড়া পড়ে। যার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটল ২ ঘণ্টার কর্মবিরতির কর্মসূচীতে। উত্তরের দার্জিলিং পাহাড় থেকে দক্ষিণের সুন্দরবন পর্যন্ত সর্বত্র বিপুল সংখ্যক কর্মচারী দাবি সম্বলিত ব্যাজ পরিধান করে ঠিক বেলা ১১.৩০ মিনিটে দপ্তর থেকে বেড়িয়ে আসেন। কলকাতার প্রধান প্রধান প্রশাসনিক ভবনগুলি থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত ব্লক পর্যন্ত ছিল একই চিত্র। সর্বত্র দু'ঘণ্টা কাজ বন্ধ করে কর্মচারীরা স্লোগান দিয়েছেন, গান গেয়েছেন, আবৃত্তি করেছেন। চোয়াল শক্ত করে মুষ্টিবদ্ধ হাতে অর্জিত অধিকার রক্ষার শপথ গ্রহণ করেছেন। রাজ্য প্রশাসনের কাঠামোর বাইরে সরকার পোষিত বিভিন্ন সংস্থাতেও ছিল একই চিত্র। কলকাতা, যাদবপুর সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরাও

মহাকরণ

কর্মবিরতি করেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্ব-স্ব সংগঠনের ডাকে বিক্ষোভ কর্মসূচীতে অংশ নেন। যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ কর্মবিরতির কর্মসূচীকে বিপুল সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান। তিনি নিজে দার্জিলিং-এর নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন পুলবাজার ব্লকের বিজনবারিতে সহকর্মীদের সাথে নিয়ে কর্মবিরতির কর্মসূচীতে অংশ নেন।

যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে বিজয় শঙ্কর সিংহ আরও জানান যে, রাজ্যব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে

দার্জিলিংয়ে কর্মবিরতিতে দেবব্রত রায়

সর্বস্তরের কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তারপরেও রাজ্য সরকার যদি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তাহলে আসন্ন

দক্ষিণাঞ্চল

শারদোৎসবের পরে আরও বৃহত্তর কর্মসূচী, এমনকি প্রয়োজনে রাজ্য প্রশাসনকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো কর্মসূচী নিতেও পিছুপা হবে না শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA | State Co-ordination Committee | Regd. No. : 18484/71
SANGRAMI HATIAR | 50th Year, 3rd-4th Edition, July-August 2022

১২ই জুলাই কমিটির কেন্দ্রীয় মিছিল ও সমাবেশ

শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক অধিকার, তাদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার, ধর্মঘট করার অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে।

মিছিলের অংশ বিশেষ

কেন্দ্রের ও রাজ্যের উভয় সরকারই সংবিধান স্বীকৃত গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এর বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন ১২ই জুলাই কমিটির ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। বিগত ১২ই জুলাই ২০২২ শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক আন্দোলনের যুক্তমঞ্চ ১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে গোটা রাজ্যজুড়েই মিছিল সমাবেশের কর্মসূচী আহ্বান করা হয়েছিল বিগত ১১-১২ জুন ২০২২ কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত ১২ই জুলাই কমিটির নবম রাজ্য সাংগঠনিক কনভেনশন থেকে। নবম রাজ্য সাংগঠনিক কনভেনশন থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন জেলাগুলিতে এমনকি কোথাও কোথাও মহকুমা / ব্লক স্তরেও প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে পতাকা উত্তোলন এবং মিছিল সমাবেশের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। কলকাতায় কেন্দ্রীয় মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেল থেকে শিয়ালদহ বিগবাজার পর্যন্ত নিম্নলিখিত ৫ দফা দাবিকে সামনে রেখে—(১) দ্রব্যমূল্য রোধে গণবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, (২) শূন্যপদে স্বচ্ছ নিয়োগ, (৩) নয়া পেনশন আইন বাতিল, (৪) সমস্ত অংশের কর্মচারী ও শিক্ষকদের বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, (৫) জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল এবং ধর্মীয় মেরুকরণের বিরুদ্ধে।

কর্মরত কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সহ ১২ই জুলাই কমিটির যুক্ত মঞ্চের অন্যান্য সংগঠনের কর্মী নেতৃত্বদের লাল পতাকায় ও বডি পোস্টারে সুসজ্জিত, শ্লোগান মুখরিত এক সুবিশাল মিছিল তীব্র প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে অতিক্রম করে শিয়ালদহ বিগবাজারে পৌঁছায়। যে মিছিল শুধুমাত্র পেশাগত দাবিতেই মুখরিত ছিল না, সমস্বরে জনসাধারণের দাবিগুলি নিয়েও সোচ্চার ছিল।

মিছিলে ট্যাবলো প্রচার

শিয়ালদহ স্টেশনের সামনে সংক্ষিপ্ত সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য সংগঠনের ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে গৃহীত কর্মসূচী বিষয়ে এবং ৫ দফা দাবির সমর্থনে বলেন। একইসঙ্গে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে দৃপ্ত শ্লোগান মুখরিত মিছিল ও সমাবেশকে সফল করার জন্য উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান। এই সভায় গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে সি আই টি ইউ-র রাজ্য সম্পাদক অনাদি সাহু বলেন, দীর্ঘ লড়াই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক কর্মচারী, শিক্ষকরা মিছিল-মিটিং ধর্মঘট করার অধিকার পেয়েছেন। তারা আদায় করেছেন ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি। কেন্দ্রীয় সরকার সেই অধিকার কেড়ে নেওয়ার তোড়জোর শুরু করেছে। একই সঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতির নামে শিক্ষাক্ষেত্রকে বেসরকারীকরণ করার পরিকল্পনা করছে। বর্তমান রাজ্য সরকার শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার বকেয়া মহার্ঘভাতা দেয় না। এর বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন ধর্মঘট সংগঠিত করলে জোরপূর্বক রাজ্য সরকার কর্মচারীদের ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টার করে চলেছে। তা সত্ত্বেও রাজ্যের শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষকরা ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন সরকারের হুমকি উপেক্ষা করেই। অস্থায়ী শিক্ষক, কর্মচারীদের সামান্য ভাতা দিয়ে শ্রমের অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। তীব্র আন্দোলনের মধ্য দিয়েই অর্জিত অধিকার আমাদের ধরে রাখতে হবে, অনাদায়ী দাবি অর্জন করতে হবে। সভায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ বলেন, নানা ধরনের আইন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাশ করিয়ে নিয়ে দুই সরকারই দেশের সম্পত্তি বেসরকারী মালিকানাধীন সংস্থার হাতে তুলে দিতে চাইছে। গত কয়েক বছরে শ্রমিক, কর্মচারীদের উপর শোষণের মাত্রা বেড়েছে। শূন্যপদে নিয়োগ প্রায় বন্ধ করে রাখা হয়েছে। চুক্তি প্রথায় নামমাত্র বেতনে সরকারী দপ্তরগুলিতে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। আমরা দাবি করছি সমকাজে সমবেতন দেওয়ার, চুক্তিতে নয় স্থায়ী নিয়োগের। মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষ নাজেহাল। জনস্বার্থ বিরোধী দুই সরকারকে উৎখাত করতে না পারলে জনগণের সুরাহা মিলবে না। সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন বামগণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ড. সুজন চক্রবর্তী। সমাবেশ পরিচালনা করেন ১২ই জুলাই কমিটির অপর যুগ্ম আহ্বায়ক মনোজ সাউ। □

দেবাশীষ রায়

রক্তদান কর্মসূচী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পুরুলিয়া জেলা শাখার আহ্বানে ২১ আগস্ট, ২০২২ কর্মচারী ভবনে স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী উদ্বোধন করেন পুরুলিয়া দেবেন মাহাত সদর হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ পার্থ প্রতীম ব্যানার্জী। তিনি রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও

বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক রামাশিস অধিকারী এবং ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক লাল মোহন গ্রহাচার্য। সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্লাড ব্যাঙ্কের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অতনু সেনগুপ্ত। সভা পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি আনন্দ মোহন মাহাত। স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে ৫ জন মহিলা সহ মোট ২৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। শতাধিক কর্মচারী এই রক্তদান কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন। □

স্বাধীনতা দিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিভিন্ন মুহূর্ত

রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে সামাজিক উদ্যোগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন যা

আগামী ২৪ থেকে ২৬ ডিসেম্বর, ২০২২ জলপাইগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হবে। তার প্রাক প্রস্তুতি হিসাবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেল কমিটি বেশ কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তারই অঙ্গ হিসাবে আজ ৩ সেপ্টেম্বর বানারহাট কলাবাড়ি চা বাগান এলাকার জনবস্তি অঞ্চলে একটি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে চা বাগান সংলগ্ন এলাকার মানুষদের সাধারণ চিকিৎসা সহ বেশ কিছু পরীক্ষাও করা হয়েছে। চিকিৎসায় সহায়তা করেছেন দুইজন স্বনামধন্য ডাক্তার এবং তাদের সাহায্য করেছেন সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত নার্সেস সমিতির সদস্যরা। কর্মসূচীর শুরুতেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক মনোজিৎ দাস জানান, রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের স্বার্থে আমরা বহু সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। আগামী চার মাসব্যাপী সেই সব কর্মসূচী জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত

হবে।

এই কর্মসূচীকে সর্বাঙ্গীন সফল করতে উপস্থিত ছিলেন চা মজদুর ইউনিয়নের নেতা নারায়ন রাজভর এবং তিলক ছেত্রী। তারা অভ্যর্থনা কমিটিকে ধন্যবাদ জানান এবং রাজ্য সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন। □

সংগঠনের প্রচেষ্টায় পেনশনে সাফল্য

২০১৯-র রোপা রুলস চালু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ০২.০১.২০১৬ পূর্ব পেনশনার্সদের পেনশন সংশোধিত হয় এবং অর্থ দপ্তরে স্মারকলিপিতে জানানো হয় এই সকল পেনশনার্স-এর সংযোজিত পেনশন পরিবর্তিত বেতনক্রমে সংশোধিত বেতনের ন্যূনতম পরিমাণের অর্ধেকের নিচে (Below 50%) হবে না। কিন্তু পেনশনারদের এই নির্দেশিকায় ০১.০১.২০০৬ পূর্ব এবং ০১.০১.২০০৬ থেকে ২৫.০২.২০০৯ (রোপা রুলস ২০০৯ ও সংশোধিত পেনশন, কমিউটেশন, গ্র্যাচুয়িটি সংক্রান্ত আদেশনামার তারিখ) পর্বে অবসরপ্রাপ্ত পেনশনারদের পরিবর্তীত বেতনক্রমে (যথাক্রমে ২০০৯, ২০১৯) উপনীত ন্যূনতম বেতনের ৫০ শতাংশ পেনশন সুনিশ্চিত করার কোনো নির্দেশিকা ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গত ২১ ডিসেম্বর '২১ রাজ্যের মুখ্যসচিবকে একটি স্মারকলিপি দেয় এবং এই নির্দেশিকা সংশোধনের দাবি জানায়। তার প্রেক্ষিতে গত ১৯ জুলাই '২২ অর্থ দপ্তরের পেনশন শাখা একটি মেমোরেন্ডাম বের করে। নং ৫২৫এফ (পেন) তাং ১৯/০৭/২২। এতে পশ্চিমবাংলার সকল পেনশনারদের পেনশন রোপা ২০১৯ অনুযায়ী সর্বশেষ উপনীত ন্যূনতম বেতনের ৫০ শতাংশের নিচে কারোরই পেনশন হবে না। এটি একটি ঐতিহাসিক সাফল্য। □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।